প্রমীলা-নজরুল

ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

নজরুল আকাদেমি, চুরুলিয়া

কবিতীর্থ চুরুলিয়া, বর্ধমান

প্রমীলা–নজরুল, ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

(Pramila Nazrul- A Biography by Dr. Buddhadeb Bandyopadhyay)

প্রথম প্রকাশ

মে ২০০৬ / ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৩

দ্বিতীয় প্রকাশ

জানুয়ারি, ২০২২ / ১৯ পৌষ, ১৪২৮

প্রকাশক

নজরুল আকাদেমি

কবিতীর্থ চুরুলিয়া, বর্ধমান

সম্পাদক, দ্বিতীয় প্রকাশ

ড. সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্যঃ ১০০/– মাত্র

ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুল সাহিত্যে লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতির উপর গবেষণা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন বিগত কয়েক বৎসর আগে। আমার শুভেচ্ছা থাকল। একথা সেদিন তাকে বলেছিলাম আমার পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। তাকে বলেছিলাম কল্যাণী কাজী, কাজী আব্দুস সালাম, উমা কাজীর সহযোগিতা নিও। ২০০৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছে। আমার ভ্রাতৃসম বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করি তুমি প্রমীলা-নজরুল সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লিখলে ভাল হয় যা এখনো পর্যন্ত এই বাংলায় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। প্রমীলা-নজরুল গ্রন্থ স্বত্ব নজরুল একাডেমীকে উৎসর্গ করে কবি-পত্নীকে প্রণাম জানিয়ে একাডেমীকে প্রকাশ করার অনরোধ করে। আমরা একাডেমীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে এ বৎসর ২০০৬ এ কবির জন্মদিনের গ্রন্থটি মানুষের হাতে তুলে দিতে পারায় সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার পূরণে একধাপ এগোতে পেরেছি। ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি সম্পর্কে মতামত দেওয়ার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। আমাদের ইচ্ছাপূরণ হয়েছে তার জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই। পাঠকরা গ্রন্থটি সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করবেন গ্রন্থটি তাদের গ্রহণযোগ্য কিনা। আমি লেখক-এর অনুমতি নিয়েই দুটি তথ্যগত বিষয়ে উল্লেখ করছি। এম. এ. বক্স এর রয়্যালটির ৮ টাকার মজুরীর পরিবর্তে ১ টাকা হবে ও অসাবধানতাবশতঃ মাথরুণ উচ্চ বিদ্যালয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম পড়াশোনা করেছিলেন তা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। ১৯১১-১৯১২ সালে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতের প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাথরুণ উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম তার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সেখান থেকে এসে সিয়াড়শোল রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সিয়াড়শোল রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চলে যান। প্রমীলা

নজরুল গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত গ্রন্থটিকে আরও কিছু তথ্য সংযোজিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। লেখক বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করে গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করবেন। লেখক সম্পর্কে নানা বাড়তি কথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করার মত আমার কোন মানসিকতা কোনদিন ছিল না, আজও নাই। একটি কথা বলব শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী করে, ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত করে তোলে, এবং দাম্ভিকতার পর্দ্দা ছিন্ন করে অগণিত মানুষের আপনজন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। প্রমীলা নজরুল গ্রন্থের লেখক ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই একজন মানুষ। আমাদের শুভেচ্ছা, ভালবাসা আগামী দিনে তার কর্ম্মময় জীবনকে সুন্দরতর করে তুলবে এই আশা ভরসায় তার চলার পথ আরও প্রশস্ত হোক এই কামনা আমাদের থাকবে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৩

নজরুল একাডেমীর পক্ষে
কাজী মজাহার হোসেন

পরিচায়িকা

অধ্যাপক ড. রামদুলাল বসু

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে এ যাবৎ অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। যে প্রতিভা মৃত্যুহীন তার সম্পর্কে কৌতুহলও যুগে যুগে কালে কালে সমান ধারায় দেখা যায়। তাই তার মূল্যায়ন ও আস্বাদন-পদ্ধতি তাকে নতুন করে পাবার আগ্রহ জানায়। নজরুলকে যাঁরা এককালে সময়ের কবি বলে সময়উত্তীর্ণ হতে বাধ সেধেছেন, তাঁদের ধারণা যে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সেটা ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানা যায়। নজরুল আজও আছেন, তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নতুন দৃষ্টিতে তাই নির্ণীত হয়ে চলেছে। তিনি থাকবেন। তাই তাঁকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক মূল্যায়ন-অবমূল্যায়নের কথা ও কাহিনী রচিত হয়ে চলবে এবং সেটাই নজরুল সম্পর্কে স্বাভাবিক ঘটনা।

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমীলা-নজরুল' নামাঙ্কিত যে পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেছেন সেটিও নজরুল-দর্শনের একটি প্রচলিত বিষয়। চরিত্রের দর্পণে ব্যক্তিত্ব দর্শনের প্রথাটি অপ্রচলিত না হলেও অনভিপ্রেত নয়। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'। তাহলে কোথায় পাব তারে? এখানে লেখক তাকে সন্ধান করেছেন তাঁর স্ত্রী প্রমীলার জীবন-দর্পণে। সেই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে পারিবারিক ও সামাজিক প্রাসঙ্গিক বিষয়। গ্রন্থ হয়ে উঠেছে নজরুলের জীবন-কাহিনী। নজরুলকে আরেক আলোয় পাওয়া। প্রমীলা ও তাঁর মা গিরিবালা নজরুলের জীবনের যেভাবে যুক্ত ছিলেন তার মধ্য দিয়ে নজরুলের আত্মবিকাশ-পর্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় পর্ব, বিবাহ এবং বিবাহোত্তর জীবনের কাহিনীপ্রসঙ্গে যে প্রমীলাকে

পাওয়া যায় সেখানে তিনি আত্মনিবেদিত স্বাতন্ত্র্যবর্জিত স্বামীগতপ্রাণা এক আদর্শ নারী। নজরুলের সংসারে গিরিবালা দেবীও হিন্দু বিধবার ধর্মাচরণে ছিলেন এক নিষ্ঠাবতী নারী। নজরুল সেখানে ধর্মসংস্কারের ঊর্ধ্বে এক মানবতাবাদী মানুষ যিনি নিজে মুসলমান হয়েও স্ত্রী ও শাশুড়ীকে স্বধর্ম পালন ও আচরণের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি। নজরুল বিয়ের ব্যাপারেও তাঁর স্বভাবজাত সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। তবে প্রমীলার বয়স (১৬) যখন বিপত্তির কারণরূপ দেখা গেল তখন তা থেকে মুক্ত হবার জন্য ইসলামের 'আহলুল কেতাব' বিবাহবিধি মানতে হয়েছিল। ১৮৭২ এর আইন অনুযায়ী (সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট)-এ পাত্রীর বয়স কমপক্ষে আঠার নির্দিষ্ট করা আছে। প্রমীলার বয়স তখন তা থেকে দু'বছর কম। ইসলামী মতে বিয়ে সিদ্ধ হতে পারে পাত্রীকে ইসলামে দীক্ষিত করলে। কিন্তু নজরুলের সেখানে আপত্তি। ধর্মের কাছে তিনি নতজানু হবেন না। তিনি পাত্রীকে স্বধর্মে রেখেই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। তিনি যে কথায় ও কাজে সমান নজরুল। অগত্যা ইসলামের একটি লৌকিক মত অনুযায়ী 'আহলুল কেতাব' বিধি অনুযায়ী হলো বিবাহ। বরবেশী নজরুলের মাথায় ছিল সাদা চাদরের পাগড়ি।

নজরুলের বিবাহোত্তর জীবনের আশ্রয়ের অভাব ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। এই পর্বে প্রমীলা-র পাশে ছিলেন তাঁর মা গিরিবালা দেবী। নজরুলের জীবনের মাতৃসমা এই শাশুড়ী-মা তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে ঝড়ঝাপটার হাত থেকে অবিচলিত চিত্তে রক্ষা করেছেন। প্রমীলার জীবনালেখ্য রচনায় তাই তাঁর মা গিরিবালা দেবীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লেখক গ্রন্থে প্রমীলা-নজরুলের জীবন উন্মোচনে গিরিবালা দেবীর প্রসঙ্গ এনে তাঁর

আলোচনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। প্রমীলার যে সর্বংসহা রূপটি আমরা পাই তার উৎসে আছেন মা গিরিবালা দেবী।

প্রমীলার কাকিমা বিরজাসুন্দরীকে নজরুল মার্তৃজ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নজরুলের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহে তাঁর সম্মতি ছিল না এবং সে কারণে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্থান নিয়েছিলেন নজরুলের আর এক মার্তৃসমা নারী মিসেস এম. রহমান; হিন্দু-মুসলমান সমাজের একাংশ এই বিবাহে সায় দেয়নি। ব্রাহ্ম সমাজও বিরুদ্ধে ছিল। অথচ তাঁরা ছিলেন হিন্দুদের তুলনায় সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল। নজরুল প্রমীলার বিবাহকে কেন্দ্র করে যে উত্তাপ ও জটিলতা দেখা দিয়েছিল তার অনেক তথ্য এখনও অপেক্ষিত, কেননা লিখিত বিবরণের অভাব। তাই নির্ভরযোগ্য নয়। প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের বিয়ে সম্ভব হতো না, যদি না নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত না হতো। নার্গিস-নজরুলের বিয়ের ব্যাপারটা যথেষ্ট তথ্যের অভাবে আজও সুস্পষ্ট নয়। গ্রন্থে লেখক অবশ্য ব্যাপারটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। নজরুল বিয়ের আসর থেকে উঠে সেই রাত্রেই বীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে দীর্ঘপথ হেঁটে কুমিল্লায় সেনগুপ্ত পরিবারে আশ্রয় নেন। এই তথ্যটিও বিতর্কিত এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কিছু তথ্যও পরবর্তীকালে কোনো কোনো গবেষক স্বীকার করেননি। তবে ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন নজরুল যে নার্গিসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্বীকার করেননি একথা কারো অজানা নয়। এর (১৯২১) তিন বছর পরে প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ। বলা বাহুল্য, উভয়ের মধ্যে প্রণয়ই দাম্পত্য সেতুবন্ধনের কারণ। এরপর নজরুল সংসার সীমায় যে আবদ্ধ ছিলেন তার কারণ প্রমীলার আত্মলীন ভালোবাসা। নজরুলকে প্রমীলা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নজরুলও ছিলেন পত্নীপ্রেমে

অকপট। হয়ত সেই কারণেই নজরুল অনেক দুঃখ-বেদনার সাগর পাড়ি দিতে পেরেছিলেন।

প্রমীলা সম্পর্কে অনেক তথ্য আজও অজানা। তবে এটা অজানা নয় যে, তিনি ছিলেন নজরুলের পরমা শক্তি। নজরুলের আবেগ, অভিমান, প্রতিবাদ, তেজ, আত্মবিশ্বাস, ত্যাগ, মানবিকতা কোনো কিছুকেই প্রমীলা লঘু করে দেখেন নি। এই অর্থে তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্র্যবিমুখ আত্মনিবেদিত প্রাণ। এই গ্রন্থে প্রমীলাকে কেন্দ্র করে নজরুল জীবনের পূর্বাপর যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা নজরুল দর্শনের স্বরূপ পরিস্ফুট করে। এই অর্থে গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হলেও নজরুল-জীবনের ধারাভাষ্যরূপে স্বীকৃতি পাবে।

লেখকের নিবেদন

জনমানসের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১০১-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর আমন্ত্রণে কবিতীর্থ চুরুলিয়ায় যায়। ভাষণ-পর্ব মেটার পর সস্ত্রীক ইয়ূথ হস্টলে ফেরার পথে কবিপত্নী প্রমীলা দেবীর সমাধিস্থলে গিয়ে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে পুস্পস্তবক নিবেদন করি। সেই মুহূর্তে হঠাৎই মনে হয় মহীয়সী এই নারীর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা খুবই জরুরি। এই ভাবনাটা মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল আশ্চর্যভাবে।

পরে একাডেমী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কাজী মজাহার হোসেন সাহেবকে আমার ভাবনাটির কথা জানাই। তিনি সাগ্রহে বলেন, 'কবিকে তুলে ধরার ব্যাপারে জ্যেঠীমার অবদানের কথা ভোলা যাবে না। তুমি কাজ শুরু কর।' তিনি আমাকে কবিপুত্র শ্রদ্ধেয়া কল্যাণী কাজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। কল্যাণীদি তাঁর লেখা 'অন্তরঙ্গ অনিরুদ্ধ' বইটি আমাকে উপহার দেন ও তাঁর শাশুড়ি-মা সম্পর্কে মৌখিকভাবে কিছু কথা জানান। এভাবেই প্রমীলা-নজরুল সম্পর্কিত কাজটির রূপরেখা নির্মিত হতে থাকে।

পরবর্তী সময়ে কলকাতাস্থিত বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের অমূল্য গ্রন্থাগারটিতে নানা সাহায্য পাই। কবি শৈলেন কুমার দত্ত তাঁর 'কবিপ্রিয়া' বইটি সরবরাহ করে সহায়তা করেন। সহধর্মিনী রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুত্র শ্রীমান সৈকত ও আরও অনেকে বইপত্র যোগান দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

নজরুল একাডেমীর প্রমীলা-জীবনের এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। এজন্য সাধারণ-সম্পাদক কাজী মাজাহার হোসেনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞা ও কবির কনিষ্ঠ-পুত্রবধূ শ্রীমতী কল্যাণী কাজী বইটি আমাকে লিখতে সাহায্য করায় আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। অক্ষরকর্মী-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিকতা রইল।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি পাঠকের ভালো লাগলে পরবর্তী সময়ে বিস্তৃত পরিসরে প্রমীলা দেবীর জীবনকথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। নজরুল-প্রমীলার অমেয় সম্পর্ককথা বাঙালির ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায়। সেই অধ্যায়টি সম্পর্কে পাঠককে সামান্য আভাস দেওয়া গেলে আমাদের এই প্রয়াস কিছুটা সার্থক হতে পারে। ডঃ রাম দুলাল বসু বিদগ্ধ সাহিত্যিক। তিনি বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। তাঁর আমার প্রণাম।

ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রকাশ বিষয়ে দু'চার কথা

আজীবন নজরুল-সাহিত্যকে অবলম্বন করে থাকা ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রত্যাশিত প্রয়াণে নজরুল-চর্চার একটি সুমহান ধারা যে অস্তমিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর প্রতিটি লেখায় ও বক্তৃতায় নজরুল-সাহিত্যের নতুন ব্যাখ্যা নতুন আঙ্গিকে হাজির হয়েছে। নজরুলের জন্মদিবস উপলক্ষে কবিতীর্থ চুরুলিয়ায় নজরুল- মেলায় মধ্য রাত পর্যন্ত নজরুল-প্রেমী মানুষেরা ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরুল বিষয়ক বক্তৃতা শোনার জন্য বসে থাকতেন এটি আমার স্বচক্ষে দেখা। কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু, কবি ও বিপ্লবী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গলাভের ফলে কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁর যৌবনকাল থেকেই ছিল। পরবর্তীতে যখন গবেষণার সুযোগ আসে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নজরুল সাহিত্যে লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এই অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকদের দ্বারা ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই ২০০৮ সালে এই অভিসন্দর্ভটি লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবনায় লোকসংস্কৃতি ও আদীবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব প্রদীপ ঘোষ লেখেন, "লেটো গানের লোকানুষঙ্গ ছুঁয়ে নজরুলের কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও চিঠিপত্রের মধ্যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নজরুলের জীবন ও সাহিত্যে লৌকিক অভিযোজন দেখাতে চেয়েছেন। আলোচনাটি নজরুল সাহিত্যের নতুন একটি দিক উন্মোচন করেছে বলে আমরা মনে করি।" বাস্তবিক এই গবেষণা প্রথম পর্যায়ে মূলত লৌকিক জীবন ও

সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছে, অতঃপর নজরুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটে ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে লোকজীবন ও সংস্কৃতির সাযুজ্য দেখাতে চেয়েছে। এই আলোচনায় প্রবাদ-প্রবচন, লোকভাষা, পুরাণ ও মহাকাব্য, ইসলামি ঐতিহ্য, রূপকথা ও উপকথা, যাদু ও লোকবিশ্বাস, লৌকিক জীবন ইত্যাদি মূল্যবান বিষয়-উপাদান পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে।

ড. বন্দ্যোপাধ্যায় শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশনায় লিখেছিলেন 'ছবিতে নজরুল জীবনী'। নজরুলপ্রেমী লেখক ও ইন্দ্রনীল ঘোষের ছবির যুগল বন্ধনে সজীব হয়ে ওঠেছে চৌত্রিশ পৃষ্ঠার পুস্তকটি। এই পুস্তকে নজরুলের পরিবারের যেমন অনেক অজানা কথা উঠে এসেছে, তেমনি এসেছে নজরুলের বহুমুখী প্রতিভার হরেক চিত্র। জানা গেছে নজরুলের গান করা, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও অভিভাষণ লেখা, ফুটবল খেলার কথা, বাঁশি বাজানোর কথা, নির্বাক ভূমিকায় অভিনয়, সংগীত পরিচালনার কথা ইত্যাদি। এই পুস্তকের শেষে লেখক বুদ্ধদেবের উপলব্ধি ছিল – "নজরুলের মৃত্যু নেই। দুই বাংলার মধ্যে তিনি যে সেতুবন্ধন করেছেন তা অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সম্প্রীতির কবি, বিশ্ব-মানবতার কবি নজরুল।"

ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল যেমন নজরুল সাহিত্য নিয়ে মৌলিক কিছু কাজ করার তেমনি নজরুলের স্বনামধন্যা অর্ধাঙ্গিনী প্রমীলা নজরুল ইসলামকে নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করা। এই ইচ্ছাটি বাস্তবায়িতও হয়েছিল চুরুলিয়ার নজরুল আকাদেমির হাত ধরে। বাংলার ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৩ সালে

তৎকালীন নজরুল আকাদেমির সাধারণ-সম্পাদক কাজী মজাহার হোসেনের প্রচেষ্টায় প্রমীলা নজরুল-এর জীবনালেখ্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই গবেষণাটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত না হয়ে পত্রিকার আকারে মুদ্রিত হয়। প্রমীলা নজরুল নামক সেই মহীয়সী নারীর জীবন-ইতিহাস পুস্তক আকারে প্রকাশ না পাওয়ায় লেখক বুদ্ধদেব মর্মাহত হন। ব্যক্তিগত পরিসরে বহুবার বলতেন, "সুযোগ হলে 'প্রমীলা-নজরুল' পুনর্বার প্রকাশিত করবো। মানুষের জানা দরকার নজরুল নামের সাহিত্যের বটবৃক্ষটির পিছনে প্রমীলা নজরুল-এর জীবনপাত প্রচেষ্টার কথা"। সেই সুযোগ জীবিতকালে লেখকের আসেনি। দীর্ঘসময় সরকারী অফিসের ফাইলের স্তূপের আড়ালে সেই ইচ্ছা আত্মগোপন করে যায়। অবসর জীবনে নজরুল চর্চার জন্য সময় পেলেও অদৃষ্টের ফেরে তাঁর জীবনতরী হঠাৎ করেই পরপারের দিকে চলে যায়। আজীবন নজরুল ভাবনায়-চর্চায় বিভোর মানুষটির প্রমীলা-নজরুলকে নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছাটি অপূর্ণ থেকে যায়। তবু যে মহতী ইচ্ছারা বিনষ্ট হয় না। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলে যাওয়ার পর তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে থাকা পত্রিকার বাণ্ডিল থেকে 'প্রমীলা-নজরুল' পত্রিকাটি বের করেন এবং তাঁর প্রাণাধিক স্বামীর ইচ্ছাটির কথাও আমার কাছে ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি নিজেই নজরুল আকাদেমির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কাজী রেজাউল করিমের সঙ্গে 'প্রমীলা-নজরুলে'র পুনর্মুদ্রণ এবং পুনর্প্রকাশের ব্যাপারে অনুমতি চান। কাজী রেজাউল করিম সানন্দে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে তাঁর শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করেন।

ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রমীলা–নজরুল’ গ্রন্থের এক জায়গায় নজরুলের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নজরুল ও প্রমীলার চার বছরের দুধের শিশু বুলবুলের প্রয়াণে নজরুল দুর্মর বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তবু বুলবুলের মৃত্যুর পরে পরেই একটি ছোট ফরাসি গাড়ি কেনেন। লেখক বলেছেন, “বুলবুলের গাড়ি চড়ার সখ ছিল। সেই অপূর্ণ সাধ পূরণ করার জন্যই তিনি বুলবুলের অকাল–প্রয়াণের পরে পরেই গাড়ি কিনেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।” এ এক অদ্ভূত সমাপতন। একইভাবে ‘প্রমীলা–নজরুল’ পুনঃপ্রকাশ প্রসঙ্গে আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য এক নজরুল–প্রেমী লেখকের অপূর্ণ সাধপূরণ। একই সঙ্গে এই পুস্তকটি যদি প্রমীলা নামের লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এক মহীয়সী ভারতীয় নারীর আড়ম্বরহীন জীবন–কথা আপামর পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে তবেই এই গ্রন্থের পুনর্প্রকাশের প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে।

ড. সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস

মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কবি নজরুল

ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নাতিদীর্ঘ সক্রিয় জীবনে যে সুবিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন তা একজন কবির কাজ – এইমাত্র নয়। একথার অর্থ এই নয় যে, কবির কাজ নিতান্তই সহজ ব্যাপার। এমনটা ভাবলেও ভুল হবে যে, যিনি কথাগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে জানেন তিনি সামান্য কোনো ব্যক্তি। কবিতাকে দিয়ে নানারকম কাজ করানো যায় একথা যেমন সত্যি, কবিতার স্বতন্ত্র অভিঘাত ও শিল্পসৌন্দর্যের বিজন মহিমাও তেমনই সত্যি। কোনো কোনো কবতি তাদের সৃষ্টির অঙ্গনে দায়বদ্ধতার বীজভূমিটি স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, দায়বদ্ধতা বলে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে তবে তার সবটুকুই শিল্পের কাছে। কাব্যের অন্তর্নিহিত বোধ ও বোধের কাছে হাঁটু মুড়ে বসতে গিয়ে তাঁরা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিকে সযত্নে উপেক্ষা করেন। আমরা বলতে চাইছি, নজরুল এইভাবে শুধুমাত্র শিল্পবোধের নিরিখে কবিতার কাছে প্রণত হয়ে তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য মিটিয়ে দেন নি। তিনি নিজেকে প্রসারিত করেছেন মানুষের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিজ-অনুভবগুলি পল্লবিত করে মানুষের প্রতি ভালোবাসায় ও দুঃখে-বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর দৃপ্ত শপথে নিজের জীবন ও সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করেছেন। এ কারণেই নজরুলকে একজন কবি কিংবা গীতিকার অথবা সুরস্রষ্টা রূপে দেখে আর পাঁচজন সমগোত্র মানুষের সঙ্গে এক করে দিলে ভুল হয়ে যাবে। বুঝতে হবে তাঁর ভূমিকাটি প্রকৃতপক্ষে একজন জননায়কের যিনি সারাটি জীবন দেশ ও দশের মঙ্গলের কথা ভেবে নিরন্ত পরিশ্রম করে গেছেন, আত্মস্বার্থ তুচ্ছ করে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

পরার্থপরতা শিল্পের পক্ষে ভালো নয় সেকথা আমরা সকলেই জানি। কবিতায় নীতি ও আদর্শের কথা কিংবা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা শিল্পবোধের নিরিখে গ্রহনীয় নয়, তাও আমাদের জানা। এই গোড়ার কথা নজরুলও কী জানতেন না? যাঁরা নজরুলকে মধ্যমেধার মানুষ বলে মনে করেন তাঁদের জেনে রাখা ভালো, তাঁর মেধা ও প্রতিভা বিস্ময়কর ব্যঞ্জনীয় ভাস্বর ছিল বলেই নানা প্রতিকূলকতার সঙ্গে লড়াই করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তিনি উঠে আসতে পেরেছিলেন। প্রতিভার লক্ষণ জয় করা – এই কথাটি যে জীবনগুলি দেখলে অনুভব করা যায়, নজরুল অবশ্যই সেই জীবনীমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় এখানেও সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অপরিসীম দায়বদ্ধতায় তিনি তাঁর লেখক–পরিচয়টিকে বিশ্বজনীন তাৎপর্যে উন্নীত করেছেন।

একেবারে ছোটবয়সে নজরুল যখন লেটো গান রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পীজীবন শুরু করেছিলেন, সেই পর্যায়ে তিনি 'চাষীর গীত'- এ লিখেছিলেন এমন কৃষি–পঙক্তি,

জীবন যাপন করিতে
চাষ কর বিধি মতে
রবে যদি সুখেতে
এ পৃথিবী মাঝার।।

....
....
....

লাগাও ধান প্রধান ফসল
তরকারি কলাই সকল;

দাও সময় মত জল
যাতে প্রাণ বাঁচে তার।
অরি হতে ফসলে
রক্ষা কর সকলে;
নজরুল ইসলাম বলে–
নইলে বাঁচা হবে ভার।।

নজরুল চাষির ঘরে জন্মাননি কিন্তু গ্রাম বাংলায় জন্মে গ্রামের কৃষক, কৃষি–শ্রমিক ও অপরাপর বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছিলেন বলেই অল্প বয়সে এমন কৃষিগীত লিখতে পেরেছিলেন। 'চাষীর গীত'-এর অন্যান্য গানে চাষবাসের সঙ্গে দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার আশ্চর্য মিশেল তিনি ঘটিয়েছিলেন কিন্তু মানবভাবনার বৃত্ত ছেড়ে তিনি একচুলও সরেন নি সেই বালক বয়সেও।

প্রথম যৌবনে নানা ধরনের কবিতা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন নজরুল কিন্তু সেই কবিতাগুলির মধ্যে দেশের লোকজীবনের নানা ছবি এবং জীবের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। 'ভগ্নস্তূপ' কবিতায় তিনি ভাঙা স্তূপটিকে লক্ষ্য করে এমন কথা বলেছেন– "(ওগো) কে তুমি আমার পল্লীমায়ের দুখের কাহিনী কহিছ" আবার 'চড়ুই পাখির ছানা' কবিতাটিতে তাড়া–খাওয়া চড়ুইয়ের বিপন্নতার ছবি তুলে ধের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখেছেন। চড়ুই পাখীর ছানা হঠাৎ করে ক্লাসঘরে পড়ে যাওয়ার পরে তার বিপন্নতার ছবিটি নজরুলকে এমন গভীরতায় স্পর্শ করেছিল যে অনাবিল আন্তরিকতায় তিনি লিখেছিলেন এই পঙতিগুলি––

ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে;

ছুটছে পাখি প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দুইটি ডানা মেলে।
বুঝতে নারি কী সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,
বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে– মায়ের সে যে বুকভরা ধন !
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে
একটি ছেলে দেখছে, আঁসু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার, ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ,
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ সোহাগ,
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে,
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশিস পরান খুলে।

একটি চড়ুই–ছানার কষ্ট দেখে হৃদয়ে ব্যথা পেয়েই কর্তব্য সমাধা করেননি 'দুখুমিঞা' নজরুল, সেই অবলা জীবটিকে দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি তাকে তার বাসায় তুলে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এটাই নজরুলের জীবন দর্শন। সারাটি জীবন তিনি নানা কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন কিন্তু নিজের জীবনপাত্রখানি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য বেদির যজ্ঞভূমির মতো পবিত্র কর্তব্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি এই পৃথিবীর কাছে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চান নি, অর্থ যশ প্রতিপত্তি– কিছুই না। তিনি চেয়েছিলেন শোষণমুক্ত ও উন্নতশির এক মানবসমাজ, যে সমাজ যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সামাজিক ন্যায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং মানবিক মুক্তিদর্শন প্রতিষ্ঠা করবে। এই ভাবনাটি মাথার মধ্যে ছিল বলেই রানিগঞ্জ সিয়ারসোল হাইস্কুলে বিপ্লবী–শিক্ষক নিবারণ ঘটকের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষাটি না দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে করাচিতে ৪৯ নং বাঙালি পলটনে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এখন তির্যক ভঙ্গিতে এমন কথা বলতে চান যে, পেটের দায়ে নজরুল সেনাবাহিনীতে নাম

লিখিয়েছিলেন। একথা সর্বৈব মিথ্যা কেননা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি কিশোর বয়সেই নজরুল আসানসোলে একটি ক্রিশ্চান গোরস্থানে গিয়ে সেখানকার সমাধিগুলিকে ইংরেজ রাজপুরুষদের বেদি বলে কল্পনা করে বন্ধু পাঁচুর এয়ারগান দিয়ে বেদিগুলিকে লক্ষ্য করে বন্দুক চালাতেন। এ থেকে বোঝা যায়, পরাধীনতার কী তীব্র জ্বালা ছোট বয়স থেকেই তার মধ্যে জাগরুক ছিল এবং কী সুতীব্র ঘৃণায় তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে স্থিত ছিলেন। সেনাবাহিনীতে গিয়ে ইংরেজের যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসে তাদের বিরুদ্ধে বন্দুক উঁচিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন এমন কথা তিনি প্রাণের বন্ধু শৈলজানন্দকে প্রায়ই বলতেন। শৈলজানন্দ এ ব্যাপারে যদিও ভিন্নমত পোষণ করতেন তবু তাঁর লেখা পড়ে আমরা সুনিশ্চিত বুঝতে পারি যে, নজরুলের এই ভাবনাটি ছিল সদর্থক ও সম্পূর্ণ আন্তরিক।

এছাড়া আরও একটি প্রমাণ আছে। এই প্রমাণটি আমরা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃত করতে পারি। প্রাণতোষবাবু লিখেছেন, "নজরুল বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ ঘটক ও তাঁর মাসীমার (দুকড়িবালা দেবী) অস্ত্র আইনে গিরিফতার, পলাতক রণেন গাঙ্গুলীর ও অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের গিরিফতারে সমস্ত পরিবেশের গুরুতর পরিবর্তনের আকস্মিক আঘাতের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যোগ্য করে তোলার উন্মাদনায় স্কুলের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র হয়েও আসন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা উপেক্ষা করে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন বলেই উল্লেখ করা বোধহয় সঠিক মূল্যায়ন হবে"।

করাচিতে থাকার সময় নজরুল তাঁর লেখায় স্বদেশপ্রেমের সঞ্জীবন-মন্ত্র প্রচার করতে থাকে। 'ব্যথার দান' গল্পের অন্যতম চরিত্র

দারা বলেছে, "...এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি বলেই আজ মার চেয়েও বড়ো জন্মভূমিকে ভালোবাসতে শিখেছি।" এই গল্পে সয়ফুল–মুলক বলেছে, "ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তি সেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে–অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা–প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তিসংঘের একজন"।

মুজফফর আহমদের লেখা পড়ে আমরা জানতে পারি, নজরুল তাঁর গল্পে 'লাল ফৌজ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকা'র মাঘ ১৩২৬ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশ করার সময় মুজফফর আহমদ বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে 'লাল ফৌজ' -এর পরিবর্তে 'মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল'- এই শব্দবন্ধ বসিয়ে দিয়েছিলেন। এর কারণ এই যে, ১৯১৮ সালে 'লাল ফৌজ' কথাটি উচ্চারণ করার রাজনৈতিক অসুবিধা ছিল। 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'য় মুজফফর আহমদ লিখেছেন, "ব্যথার দান প্রেমের গল্প তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে দেশপ্রেম আর আন্তর্জাতিকতার প্রচারও আমরা দেখতে পাই"।

করাচিতে ব্রিটিশের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বসে উনিশ বছরের নব্যযুবা নজরুল কী অসীম সাহসে রাশিয়ার মহান বিপ্লবের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে ও বিপ্লব সম্পর্কীত কাগজপত্র যোগাড় করতেন, রোমহর্ষক সে কাহিনি পড়লে তাঁকে তারিফ জানাতেই হয়। ২৪–০৬–১৯৫৭–এ লেখা একটি চিঠিতে করাচি

সেনানিবাসে নজরুলের অন্যতম বন্ধু জমাদার শম্ভু রায় কবির আর এক বন্ধু ও জীবনীকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন, “আমাদের ব্যারাকের কর্তৃপক্ষের শ্যেনদৃষ্টি ছিল যাতে আমরা বাইরে থেকে কোনো রাজনৈতিক খবর না পাই। সে জন্য পত্র-পত্রিকা যা আসত তা পরীক্ষা করে আমাদের দেওয়া হত। তা সত্ত্বেও ‘বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো’- র মতো হওয়ার দরুণ ও (নজরুল) সব খবরা-খবর কি করে জোগাড় করত, সে-ই জানে।...একদিন সন্ধ্যায় ১৯১৭ সালের শেষের দিকেই হবে- ঐ দিন যখন সন্ধ্যার পর তার (নজরুলের) ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু, তার অর্গান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম, অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে-মুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ি ছিল হুগলি শহরের ঘুটিয়াবাজার নামক পল্লীতে। তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গৎ বাজানোর পর নজরুল সেই দিন যে-সব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই জানতে পারলাম যে, রাশিয়ার জনগণ জারের থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং, ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়”।

দেখা যাচ্ছে মাত্র ঊনিশ বছর বয়সেই নজরুল রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয় রেখেছেন। রুশ বিপ্লব পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের কাছে যে যথার্থই মুক্তির সংগ্রাম সেকথা ১৯১৭-তেই বুঝতে পারা খুব সহজ কথা ছিল না। মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি নজরুলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে তিনি রুশ বিপ্লবের সাফল্যে এতটা উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কাজেই নজরুল নিছক উত্তেজনা বা খামখেয়ালের বশে অথবা কিছু রোজগারের জন্য সেনাবাহিনিতে যোগ দিয়েছিলেন, এটা পুরোপুরি অপপ্রচার। আরও একটা কথা আমাদের

মাথায় রাখা দরকার। ১৯২০ সালে ৪৯ নং বাঙালি পলটন ভেঙে গেলে সৈন্যশিবিরভুক্ত সৈনিকদের বিভিন্ন সরকারি পদে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নজরুল সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পথে আত্মনিয়োগ করেন। চিরসখা ও অন্যতম অভিভাবক মুজফফর সাহেবের সাহচর্য খেয়ালী কবি-সৈনিককে মানুষের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রবক্তারূপে গড়ে তুলতে থাকে। এরই ফলশ্রুতি 'কামাল-পাশা', 'বিদ্রোহী', 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রভৃতি কবিতা, 'ম্যয় ভুখা হুঁ' ও অন্যান্য জ্বালাময়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সংবাদ ও সম্পাদকীয়। 'মোসলেম ভারত', সাপ্তাহিক 'বিজলী', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', ধূমকেতু, সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্য দিয়েই নজরুলের উত্থান, এই সব পত্র-পত্রিকায় তিনি কার্যত দু'হাতে লিখে চলেছিলেন। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্যটি ছিল পরাধীন জাতির হৃদয়ে স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চার। পাশাপাশি, মানবিক বোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আন্তর্জাতিক ভাবভাবনার সঙ্গে এদেশের মুক্তিকামী মানুষকে একাত্ম করে তোলার মহান দায়িত্বটিও তিনি তাঁর জীবন ও সাহিত্যে বরণ করে নিয়েছিলেন।

১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নজরুল লিখলেন, "স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত রকম থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লি অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না"। ১৯২২ সালে যে কথাটি নজরুল বলেছিলনে ১৯৪৭-এর আগস্টে স্বাধীনতার পুণ্য মুহূর্তে সেই কথাটিকে আমরা মর্যাদা দিই নি। স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষ অনেক রক্ত দিয়েছেন ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন কিন্তু নেতৃবর্গের একাংশের আপোষকামিতার জন্য

স্বাধীনতা নিছকই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রহসনে পরিণত হল। ভৌগোলিক ভূখণ্ডের ওপর আমরা সংবিধানিক কর্তৃত্ব পেলাম বটে, তথাপি আমাদের মন ভরল না কেননা দেশের প্রান্তিক মানুষ সঠিক অর্থে তার অধিকারটুকু বুঝে নিতে পারল না। ইদানীং আমরা লক্ষ্য করছি মার্কিন পুঁজির সঙ্কট বিশ্বায়নের মোহময়তায় তৃতীয় বিশ্বের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা বেশ বুঝতে পারি, নজরুল যে বলেছিলেন "বিদেশির মোড়লির অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না", স্বাধীন ভারতের মাটিতে সেই প্রত্যয় আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি।

১৯২৫ সালের শেষের দিকে মাদারিপুরে নিখিলবঙ্গ ধীবর সম্মেলনের জন্য নজরুল 'ধীবরদের গান' লিখেছিলেন। 'লাঙল' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (০১.০১.১৯২৬) তাঁর লেখা 'কৃষকের গান' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন'-এ 'শ্রমিকের গান', ছাত্র সম্মেলনের 'ছাত্রদলের গান' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন'-এ সুবিখ্যাত 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' লিখে তিনি দেশের যুবসমাজের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। প্রায় সমসময়ে 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কবিতাবলী এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ঐ কবিতাগুলি রুশ ভাষায় তর্জমা হয়েছিল বলে শোনা যায়। 'চরকার গান', 'ঝড়', সব্যসাচী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা কবিতা সংকলন 'চিত্তনামা' ও অপরাপর গান–কবিতা, প্রবন্ধ–নিবন্ধ–অভিভাষণ–সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে নজরুল নিজেকে যেভাবে ক্রমাগত প্রকাশ করছিলেন তার সবটুকু ছুঁয়ে তাঁর চেতনার স্বরূপটি নিজস্ব অভিঘাতে প্রতিভাত হয়েছিল।

অনেকে বলেন নজরুল মূলত প্রেমের কবি। এই কথাটির অর্থ আমরা ঠিকঠিক বুঝতে পারি না। তাঁর জীবনের ব্যক্তিপ্রেমের ব্যঞ্জনা সাহিত্যের অঙ্গনে অধরা থাকেনি কিন্তু মানবপ্রেমের বৃহত্তর স্বতস্ফূর্ত প্রেরণা তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল এবং সক্রিয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সে-প্রেরণার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি। ১৯২৮ সালের পর থেকে তিনি গানের জগতে চলে যান। ১৯৩০-এ প্রিয়তম পুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যু ও অপরাপর নানা আঘাতের ফলে তিনি ক্রমশ ভক্তিমার্গের দিকে ঝুঁকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'যত মত তত পথ'- এর ভাবাদর্শ, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এবং উদার ও মানবিক সর্বজনীন প্রেমধর্ম তাঁর কবিতা ও গানে প্রকাশ পেতে থাকে। 'দাও মানবতা ভিক্ষা দাও' এমন যুগবাণী তিনি যেমন উচ্চারণ করেন, পাশাপাশি 'একই বৃন্তে দুটি কুসুমে'র মতো 'হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান' কিংবা 'ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা/ ত্যাগ চাই, মর্সিয়ে ক্রন্দন চাহি না', অথবা 'রক্তাম্বর পর মা এবার/ জ্বলেপুড়ে যাক শ্বেতবসন/ দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন / বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্/ শ্বেত শতদল বাসিনী নয় আজ/ রক্তাম্বরধারিণী মা/ ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর/ সৃষ্টির নম পূর্ণিমা'- সর্বতোভাবেই মানবিকতার মহামন্ত্র হয়ে পল্লবিত হয়। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যে কোথাও বিন্দুমাত্র সংকীর্ণতা, জটিলতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা ধর্মমোহ নেই- তিনি সর্বজনীন ভাবধর্মে উদ্বুদ্ধ এক মহান যুগপুরুষ।

অনেকে বলেন নজরুল তাঁর সাহিত্যে কেবলমাত্র যুগ-প্রয়োজনটুকুই সাধন করেছেন। তাই তাঁর লেখা বিশেষ একটি গন্ডিতে আবদ্ধ - এই কথাটিও আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। নজরুল-সাহিত্য যদি কেবলমাত্র পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হত, তবে ১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর কবিতা

ও গান অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ততায় উচ্চারিত হত না। তিনি কালোত্তীর্ণ কবি বলেই জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার দুঃসহ মুহূর্তগুলিতে আমরা আজও তাঁর গান গাই। 'মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' কিংবা 'জাতের নামে বজ্জাতি' অথবা 'বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে' আমাদের সাহিত্যে মিথের মর্যাদা পেয়েছে। টিকিপুর ও দড়িস্তানের যে কথাটি নজরুল গভীর দুঃখে তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, সাম্প্রদায়িকতার 'ন্যাজ'টি দেখে যে বেদনা অনুভব করেছেন, সেই সত্যভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি বলেছেন হিন্দু-মুসলমানের শেকহ্যাণ্ড করিয়ে দেওয়াই তাঁর জীবনের একমাত্র অভিমুখ।

আমরা তাই শুরুতেই বলেছিলাম, নজরুলকে কবি, গীতিকার কিংবা সুরকার অভিধায় আটকে রেখে তাঁর মূল্যায়ন করলে তা যথার্থ হবে না। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সংবাদ, সম্পাদকীয়, অভিভাষণ ও প্রতিভাষণ, চিঠিপত্র, লোকসাহিত্য প্রভৃতি বহুবিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে নজরুল-প্রতিভার যে বিস্ময়কর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তা এক মানবদরদী শিল্পীর হৃদয়-রাঙানো ভাবব্যঞ্জনার মূর্ত প্রকাশ। নজরুল একজন সম্পূর্ণ মানুষ। তাই ব্যক্তিগত দুঃখ তাঁকে যেমন ব্যথিত করে, সমষ্টির দুঃখ-বেদনাও তাঁকে প্রবল অভিঘাতে স্পর্শ করে। মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ছিল বলেই তিনি দেশের জন্য প্রতিবাদী কবিতা-লিখে এক বছরের সশ্রম কারাবাস মাথা পেতে নিয়েছিলেন। সারাটি জীবন তিনি অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তাঁর একাধিক বই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন। ব্যবস্থার সঙ্গে তিনি হাত মেলাননি বলে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। তবু একদিনের জন্যও মাথা নোয়াননি তিনি, 'বলো বীর- /বলো উন্নত মম শির' এই মন্ত্রে অভিষিক্ত হয়ে গণমানুষের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে মানবতার ভূমিতে হেঁটে গেছেন

তিনি। তাঁর জীবন ও সাহিত্যের শিকড়টি গ্রামীণ পরিবেশে, দরিদ্র জনমজুর ও ভাগচাষিদের মধ্যে, সাধারণ প্রান্তিক মানুষের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি শহুরে জীবন-যাপন করলেও তাঁর জীবন ও সাহিত্যে শিকড়চ্যুতির ঘটনা কখনই ঘটে নি। তাই লোকসম্ভব কবি-রূপে তিনি মানুষের কাছে আজও পরম আদরে বেঁচে আছেন এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দিনে মানুষ তাঁর অগ্নিক্ষরা লেখনীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে পারেন না।

নজরুল 'লাঙল' কাগজটির মধ্য দিয়ে দেশের গরিব চাষিভাইদের লড়াই-সংগ্রামের কথা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে মুজফফর আহমদের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় কৃষক-সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। মুজফফর আহমদ, নজরুল ও গণমুখী নজরুল-সাহিত্য ভারত ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। নজরুলের বিস্ময়কর প্রতিভা ও অপরিমেয় আবেগ মুজফফর আহমদের অভিভাবকত্বকে গণ-আন্দোলনের পথে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। পরে জীবনের সীমাহীন ঘাত-প্রতিঘাতে নজরুল-প্রতিভা ভিন্ন অভিমুখে ছুটে গেলেও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধিতার মহান কর্তব্যবোধ থেকে নজরুল কখনই সরে আসেননি। এই দায়বদ্ধতার কারণে তাঁর লেখালেখির ক্ষতি হয়েছে কিন্তু সে সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষের ভুবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। জীবনের শেষ অভিভাষণে নজরুল বলেছিলেন, "হিন্দু-মুসলমানে দিন-রাত হানাহানি, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষের জীবনের একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব- অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে- এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম"। ভেদজ্ঞান ও অসাম্যের বিরুদ্ধে খাড়া-শিরদাঁড়া, গণমানুষের কবি নজরুল তাঁর

অপরিমেয় দায়বদ্ধতা নিয়ে মানুষের মাঝে বেঁচে আছেন ও থাকবেন। কোনো বিরুদ্ধ প্রচার তাঁকে হৃদয়াসন থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

প্রমীলা-নজরুল

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক জীবনের জীবনসঙ্গীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি পৃথিবীব্যাপী কবি সাহিত্যিকদের জীবনপঞ্জি খুঁজে দেখি, সঙ্গতভাবেই দেখতে পাবো, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মেলবন্ধনে সৃজনীশক্তির অসামান্য বিকাশ ঘটেছে দেশে, দেশান্তরে। যে প্রতিভাটি বিকশিত হলো তার আড়ালে নিয়ামক শক্তি হিসাবে রয়ে গেল আরো একটি প্রতিভা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আড়ালের এই শক্তিটি লোকচক্ষুর আগোচরে থেকে যায়। মানুষ তার খোঁজ পায় না কখনো। বহুক্ষেত্রে খোঁজ রাখতেও চায় না। ফলে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিদ্রোহী কবি, জনমানসের কবি, ভারতীয় ভাবধারা অন্যতম প্রধান কবি-সারথী কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য পর্যালোচনা করলে আমরা উপরোক্ত সত্য-বীক্ষণের স্থিত হতে পারি। তাঁর ঝঞ্ঝাবহুল ও তীব্র গতিময় জীবনে বড়ো একটি অংশে দক্ষ কাণ্ডারীর মতো হাল ধরেছিলেন তাঁর সহধর্মিনী প্রমীলা নজরুল ইসলাম। নজরুল জীবনের প্রথম পর্বে যেমন বিপ্লবী নেতা মুজফফর আহমদ, পরবর্তী পর্যায়ে পূর্বাপর প্রমীলা নজরুল। এই দুই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গ-সাহচর্য ছাড়া নজরুল-প্রতিভার বিকাশলাভ সম্ভব ছিল না। সময়ান্তরে দাঁড়িয়ে আমরা সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই। বিশেষত, আড়ালে থাকা নিয়ামক শক্তি প্রমীলা নজরুলের অসাধারণ ভূমিকার উজ্জ্বল পুনরুদ্ধার আমাদের একটি জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

'সূর্যমুখী' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলনে, "সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব। আমার প্রমোদের হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ"। কবি-সাহিত্যিকদের জীবন অনুধ্যান করলে এ কথার সত্যতা আমরা বুঝতে পারি। কেবল লেখক-জীবন কেন, যে কোন মানুষের জীবনেই একথা সত্য। তবে, জীবন প্রতিষ্ঠার পথে প্রয়োজন বলে বড়ো মানুষদের জীবনে এ সত্য বেশি বেশি প্রতিভাত হয়। রামচন্দ্রের জীবনে সীতাদেবী, রামকৃষ্ণদেবের জীবনের সারদামণি, বিদ্যাসাগরের জীবনে দিনময়ী দেবী, গান্ধীজীর জীবনে কস্তুরবা, দেশবন্ধুর জীবনে বাসন্তী দেবী, অরবিন্দের জীবনে মৃণালিনী দেবীর অসামান্য ভূমিকার কথা আমরা অবগত আছি। মধুসূদন-জায়া হেনরিয়েটা, দীনবন্ধু-জায়া অন্নদাসুন্দরী দেবী, বিহারীলাল-জায়া কাদম্বরী দেবী, হেমচন্দ্র-জায়া কামিনী দেবী, বঙ্কিম-জায়া রাজলক্ষ্মী দেবী, শিবনাথ জায়া প্রসন্নময়ী দেবী, নবীনচন্দ্র-জায়া সুরবালা দেবী, অতুলপ্রসাদ-জায়া হেমকুসুম দেবীর নামও উল্লেখ করতে পারি। নেপথ্য-ভূমিকায় এমন হাজার হাজার মহীয়সী নারী লেখক-শিল্পীদের তথা কর্মবীর মণীষীদের জীবনে নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন। আজও পৃথিবীর নানা প্রান্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে নারীর এই অসামান্য ভূমিকা ক্রিয়াশীল। ভবিষ্যতেও এই ঐতিহাসিকতার অনুবর্ত সমান ক্রিয়াশীল থাকবে। এডিটেড

এই অনুষঙ্গে নজরুল-জীবনে প্রমীলা দেবীর মহতী ভূমিকার গুরুত্ব আমরা সন্ধান করতে চাইব। নজরুলের সংগ্রামময় প্রমীলাদেবীর অসামান্য প্রভাব-কথার আলোচনাসূত্রে আমরা খুঁজে দেখব এই মহীয়সী নারীর জীবনবৃত্তান্ত। যে নারী, কবিকুলসম্রাট রবীন্দ্রনাথের

ভাষায়, 'সুদিনে দুর্দিনে/ কল্যাণ কঙ্কন করে/ সীমান্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু/ গৃহলক্ষী দুঃখে সুখে পূর্ণিমার ইন্দু/ সংসারের সমুদ্রে শিয়রে' --তার প্রসারিত ছায়া যুগে-যুগান্তরে অসামান্য নারীগণের চরিত্রপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। প্রমীলা নজরুল এমনই এক মহীয়সী চরিত্র। আসুন আমরা তাঁর জীবনকথায় মনোনিবেশ করি।

(২)

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার নাম অনেকেই জানেন। এই মহকুমার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে বাংলা ১৩১৬ সালের ১৭ই বৈশাখ প্রমীলা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল আশালতা সেনগুপ্তা। ডাকনাম দোলন বা দোলনা। গুরুজনেরা আদর করে 'দুলি' নামে ডাকতেন।

প্রমীলার পিতার নাম বসন্তকুমার সেনগুপ্ত। তিনি বঙ্গদেশস্থ ত্রিপুরায় নায়েব পদে চাকরি করতেন। তাঁর সহধর্মিণী অর্থাৎ প্রমীলার জননী ছিলেন গিরিবালা দেবী। চাকরিসূত্রে ত্রিপুরায় বসন্তকুমার সপরিবার থাকতেন। প্রমীলার বয়স তখন বয়সে বেশ ছোট। তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল এক কবি-হৃদয়। অন্তর্লীন হৃদয়-ব্যঞ্জনায় প্রকৃতির অপরিমেয় রূপ-লাবণ্য তিনি দু-চোখ ভরে আস্বাদন করতেন। তাঁর চেহারাটি ছিল ভারি সুন্দর। চাঁপার কলির মতো গায়ের রঙ, সুশ্রী মুখমণ্ডল। মধুর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন সকলের আদরের। তাঁর শান্ত, উজ্জ্বল চোখদুটিতে ছিল অপ্রতিরোধ্য জীবনময়তা। এই কন্যাটিকে ঘিরে বসন্তকুমার ও গিরিবালা দেবীর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু মানুষের জীবনে সুখ বড়োই ক্ষণস্থায়ী। ছোট ও সুখী পরিবারটির উপরেও সহসা নেমে এল কালের অমোঘ খড়্গ। অত্যন্ত অভাবিত-ভাবে হঠাৎই এক কালরোগে অকালে প্রয়াণ করলেন বসন্তকুমার সেনগুপ্ত। প্রমীলাকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়লেন গিরিবালা দেবী। ছোট মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যান, কী করেন ! সংসারের ভার একা সামলানই বা কেমন করে ! দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঢেকে ফেলল গিরিবালা দেবীর জীবন।

গিরিবালা দেবী ছিলেন অসাধারণ এক নারী। 'গিরিবালা' অর্থে যদি উমা ধরি, তাঁর জীবনে ত্যাগ ও দৃঢ়তা ছিল পুরাণকথার সমার্থক। কঠিক দুঃসময়ে ধৈর্য ধারণ করতে তিনি জানতেন। স্বামীর অকালপ্রয়াণে যদি স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে বিহ্বল ও শোকাতুর করেছিল, তথাপি দ্রুত ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললেন তিনি। কন্যাটির ভবিষ্যৎ ভাবনায় এই ধীরতা প্রার্থিত ছিল।

তাঁর দেবর ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কুমিল্লার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ইনস্পেকটর ছিলেন। গোমতী নদীর তীরে কান্দিরপাড়ে তাঁর বাসা ছিল। ইন্দ্রকুমারের সাথে কথাবার্তা স্থির করে গিরিবালা শিশুকন্যাকে নিয়ে কান্দিরপাড়ে তাঁর (ইন্দ্রকুমারের) বাসায় এসে উঠলেন। এখানেই শুরু হল গিরিবালা ও প্রমীলার জীবনের নতুন অধ্যায়। কান্দিরপাড়ে সেনগুপ্ত পরিবারটি ছিল সর্বার্থে সুন্দর। এই পরিবারে স্বাদেশিকতার একটি পরিমণ্ডল ছিল। পরাধীনতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার কাজে সকলেরই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, এই মত পরিবারের সদস্যরা পোষণ করতেন এবং স্বাদেশিকতায় তাঁদের কারো কারো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদত ছিল। এছাড়া এই পরিবারে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কাব্য-সাহিত্যের ধারাবাহিক চর্চা ছিল। সামগ্রিক মানসিক ঔদার্যে পরিবারটি ছিল বিশিষ্ট।

এই পরিমণ্ডল কিশোরী প্রমীলার উপর সদর্থক প্রভাব বিস্তার করেছিল। মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন গিরিবালা। ছোট মেয়েটির মধ্যে প্রতিভার বিকাশ নানাভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। পারিবারিক বৈশিষ্ট্য-সূত্রে সে বিকাশের প্রতি সকলেরই তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

প্রমীলা ছিলেন বয়সের তুলনায় বেশ বড়োসড়ো। প্রাণবন্ততায় ভরপুর থাকতেন সদাসর্বদা। দুটি বিনুনি ঝুলিয়ে, বই-খাতা বুকে নিয়ে তিনি যখন স্কুলে যেতেন, গিরিবালার হৃদয় ভরে উঠত। ছোট মেয়েটির কন্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে হৃদয় মথিত হত সুধীজনের। সংসার-কন্টকপথে দুর্গম যাত্রায় প্রমীলাকে নিয়ে স্বপ্নচারিতায় মশগুল থাকতেন গিরিবালা।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তাল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন বিশেষ একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মহাত্মা ডাক দিয়েছেন, স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত ত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকারের সার্বিক অসহযোগিতার। তাঁর আহ্বানে দলে দলে মানুষ স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত ছেড়ে পথে নামছেন। কান্দিরপাড়ে সেনগুপ্ত পরিবারেও মহাত্মার এই আবেদন পৌছল। কিশোরী প্রমীলা স্থির করলেন তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করবেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তে ছিল দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস। স্বাদেশিকতায় সমর্থন থাকায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো বাধা এল না। প্রমীলা স্কুল ছাড়লেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর। ঐ বয়সেই মিছিল-মিটিংয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। রাজনৈতিক সভাতেও হাজির থাকতেন। চাপা-স্বভাবের মেয়েটির মধ্যে এভাবেই ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছিল মহতী এক সম্ভাবনা।

লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তী জীবনে যিনি বিপ্লবী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের সহধর্মিণী তথা সহযোগী ব্যক্তিত্ব রূপে এশিয়া মহাদেশের বড়ো একট অংশে আত্মপ্রকাশ করবেন, তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায়টিও অনিবার্য অনুষঙ্গে স্বাদেশিকতা তথা বিপ্লবী-মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়েছিল। আসুন, এখন আমরা, প্রমীলার সাথে আলাপ-পরিচয়ের পূর্ববর্তী সময়ে নজরুল-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করি ও ক্রমশ নজরুল-প্রমীলা অনন্ত প্রবাহ অবগাহন করি।

(৩)

বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানা অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম কবিব্যক্তিত্ব কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফকির আহমদ, জননী জাহেদা খাতুন। তাঁর পিতামহ ছিলেন কাজী আমিনুল্লাহ ও মাতামহ মুনসী তোফায়েল আলি। নজরুলের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিহারের পাটনার অন্তর্গত হাজিপুরের অধিবাদী। সম্রাট শাহ আলমের বিচারালয় ছিল। নজরুলের পূর্বপুরুষেরা সেই বিচারালয়ের আয়মা সম্পত্তি পেয়ে বিচারের ভার গ্রহণ করেন এবং চুরুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। অর্থাৎ সরকারি কাজের সূত্রেই কাজী পরিবারের চুরুলিয়ায় আগমন। কয়েক পুরুষ ধরে কাজীর দায়-দায়িত্ব প্রতিপালনও তাঁরা করেছেন।

চুরুলিয়া কাজী বাড়ীর (বর্তমান নজরুল একাডেমি) পূর্বদিকে রাজা নরোত্তম সিংহের গড়। দক্ষিণে পীরপুকুর। পীরপুকুর যাঁর নামে তিনি (হাজি পাহলোয়ান) ছিলেন বড়ো একজন সাধক। পুকুরের পূর্বপারে আজীবন এই মাজার ও মসজিদের সেবার করে পরিবারের

ভরণপোষণ করে গেছেন। ফকির আহমদ দাহেবের দুই বিবাহ, সাত পুত্র ও দুই কন্যা। চারটি ছেলে অবশ্য শিশুকালে মারা যায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠভ্রাতা কাজী আলী হোসেন ও ভগিনী উম্মে কুলসুম। স্বল্প আয়ে পরিবারটির ভরণপোষণের খুবই অসুবিধা হত। কিন্তু স্বাভাবিক ঔদার্যগুণে এবং সহজ-সরল জীবনযাপনের সূত্রে শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক বোধসম্পন্ন এই পরিবারটি নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৭ চৈত্র কাজী ফকির আহমদ প্রয়াত হন। ফলে পরিবারটি গভীর সংকটে পড়ে। কষ্টের মধ্যেই মানুষ হতে থাকেন নজরুল। তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। সংসারের চাপে ঐ মক্তবেই শিক্ষকতার কাজে তাঁকে যুক্ত হতে হয়। এক বছর শিক্ষকতা করার পাশাপাশি তিনি নিকটস্থ গ্রামে মোল্লাগিরিও করতেন। হাজি পালোয়ানের মাজার শরীফে তিনি খাদেম (সেবাইত) হন, গ্রামের মসজিদে এমামতি (নামাজে নেতৃত্বদান) করেন। এভাবে তিনি যা রোজগার করতেন তা মায়ের হাতে সংসার-খরচ হিসেবে তুলে দিতেন। স্বভাব-বাউল নজরুল কোন কাজের মধ্যে বরাবরের জন্য বাঁধা থাকতে পারতেন না। বালক বয়সেই তাঁর কবি-মন তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছিল একধরণের অস্থিরতা। তাঁর পিতা ও পিতৃব্য (কাজী বজলে করিম) ছিলেন ফারসি ও বাংলা কাব্যে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। তাঁর মধ্যে এই ধারা প্রবাহিত হয়। তাই শিক্ষকতা বজলে করিম সাহেবের লেটো দলে (নাট্যগীতিময় সম্প্রদায়, বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি সংঘ) যোগ দেন। পরে শেখ চাকর গোদার দলেও তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। মাত্র বারো-তেরো বছর বয়সেই লেটোগান ও পালা রচনায় তিনি এমন মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন যে, চুরুলিয়া, নিমসা ও

রাখাখুড়া- এই তিন গ্রামের পালা রচনার দ্বায়িত্বভার তিনি লাভ করেন। শকুনি বধ, মেঘনাদ বধ, চাষার সঙ, আকবর বাদশা, রাজপুত্র প্রভৃতি পালা লেখেন। এ কাজে যেটুকু অর্থাগম হত তা তিনি সংসারে তুলে দিতেন।

এরপর নজরল তাঁর বাউল স্বভাবের কারণে হঠাৎই একদিন চুরুলিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। বাংলার লোকজীবন ও সংস্কৃতির নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কাটালেন। পড়াশোনায় ভালো ছিলেন বলে নষ্ট-হওয়া সময় খানিকটা উদ্ধার করার জন্য একেবারে ষষ্ঠ শ্রেণীতে (পঞ্চম শ্রেণী বাদ) ভর্তি হওয়ার জন্য জেদ ধরলেন। সেইমতো বর্ধমান জেলার মাথরুন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তিনি ভর্তি হন (১৩১৮) এবং বছরখানেকের মতো পড়াশোনা করেন। এখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এরপর শখের কবিগান, রেলের এক গার্ডসাহেবকে গান শোনানোর কাজ, আসানসোলে এ.এম.বকস-এর রুটির দোকানে আট টাকা মাইনের পরিশ্রম প্রভৃতি অতিক্রম করে আসানসোলের এক দারোগা কাজী রফিজউদ্দীন আহমদের সুনজরে পড়ে তিনি দারোগা সাহেবের দেশের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানা অন্তর্গত কাজীর-সিমলা গ্রামে চলে যান। দারোগা সাহেব নজরুলকে নিকটবর্তী দরিরামপুর হাইস্কুলে ফ্রি-স্টুডেন্ট হিসাবে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন সেটা ১৩২১ সাল। দরিরামপুরে একবছর পড়াশোনা করে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে পরেই তিনি আবার নিজের জেলায় ফিরে আসেন।

১৩২২ সালে তিনি রাণীগঞ্জে শিয়ারশোল রাজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে মহামেডান বোর্ডিংয়ে তিনি থাকতেন। রাজ স্কুলে তাঁর প্রা‍েণের বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই স্কুলে তিন বছর পড়াশোনার পর বিপ্লবী শিক্ষক

নিবারণ ঘটকের প্রভাবে তিনি দেশজননীর কাজে আত্মোৎসর্গ করার কথা ভাবেন। নিবারণবাবু ও তাঁর মাসীমা 'প্রথম নারী বিপ্লবী' দুকড়ি বালা দেবী রডা কোম্পানীর পিস্তল জিম্মায় রাখার অপরাধে ধরা পড়েন। ১৩২৪ সালে এই গ্রেফতারি ঘটে ও নিবারণবাবুর ৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। নিবারণবাবু কারান্তরালে চলে যেতেই রাজ স্কুলের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ কমে যায় এবং স্কুলের ফার্স্ট বয় হওয়া সত্ত্বেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় না বসে তিনি সৈন্যদলে নাম লেখানোর উদ্যোগ করতে থাকেন।

ছোটবয়স থেকেই নজরুলের দেশপ্রেম ছিল তীব্র। ইংরেজরা আমাদের দেশকে পরাধীন করে রেখেছিল বলে ইংরেজের প্রতি তাঁর ক্রোধের সীমা ছিল না। স্থানীয় এক ক্রিশ্চান গোরস্থানের বেদিগুলিকে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ কল্পনা করে তিনি খেলনা বন্দুক দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালাতেন। দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে হলে নজরুল ভাবলেন, এই সুযোগে যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখে নেবেন। পরে ঐ যুদ্ধবিদ্যা কাজে লাগিয়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বেন। প্রি-টেস্ট পরীক্ষার পর নজরুল আর শৈলজানন্দ কলকাতায় এসে ৪৯ নং বাঙালি রেজিমেন্টে ঢোকার পরীক্ষা দিলেন। নজরুল উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু দৈহিক মাপজোপে নামঞ্জুর হয়ে শৈলজানন্দ ফিরে গেলেন কয়লাকুঠির দেশে।

১৩২৪ সালে নজরুল ৪৯ নং বাঙালি পলটনের সৈনিক পদে যোগ দেন। প্রথমে তাঁকে যেতে হয় লাহোরে। লাহোর হয়ে চলে যান নৌশেরা বা নওশেরায়। 'রিক্তের বেদন' গল্পে নৌশেরার কথা আছে। কবি-জীবনের নানা অদ্ভূত অভিজ্ঞতা হয় নৌশেরাতে। সেখানে তিনমাস ট্রেনিং নেওয়ার পর চলে যান করাচি সেনানিবাসে। করাচিতে তিনি ১৩২৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন। করাচি সেনানিবাসে থাকার সময় তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্পগুলির বেশ কয়েকটিতে

নায়ক চরিত্রের সঙ্গে নজরুলের মিল দেখা যায়। গল্পগুলিতে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দেখে অনেকে মনে করেন নজরুল মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন। তবে এই ধারণা ঠিক নয়। করাচি সেনানিবাসে তিনি বছর তিনেকের মতো ছিলেন এবং পলটনের কোয়ার্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

৪৯ নং বাঙালি পলটন ভেঙে গেলে নজরুল কলকাতায় চলে আসেন। করাচিতে থাকাকে তিনি যে সকল গল্প ও কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। এই পত্রিকাটি ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্র। সমিতির সহকারী সম্পাদক ও সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন নেতা মুজফফর আহমদ। নজরুল তাঁর লেখাগুলি সুদূর করাচি থেকে মুজফফর সাহেবের কাছেই পাঠাতেন। সমিতির ঠিকানা তথা মুজফফর সাহেবের আস্তানা ছিল ৩২, কলেজ স্ট্রিটের একটি দোতলা বাড়ি। কলকাতায় ফিরে নজরুল প্রথমে তাঁর বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাগবাজারের মেসে ওঠেন। এরপর রমাকান্দ বোস স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির দফতরে। এখানে মুজফফর আহমদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। কালক্রমে সে পরিচয় ঐতিহাসিক এক বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সে-বন্ধুত্বের কথা বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ট পাঠক-পাঠিকাগণ অবহিত আছেন, একথা আমরা সকলেই জানি।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে করাচির পলটন ভেঙে যায়। চৈত্র মাস নাগাদ নজরুল কলকাতায় বসত শুরু করেন। ৩২, কলেজ স্ট্রিটে তখন সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির প্রবল আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে নজরুল যুক্ত হলেন 'নবযুগ' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশঃ আষাঢ়, ১৩২৭) যুগ্ম-সম্পাদক রূপে। পাশাপাশি ১৩২৭ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বাঁধনহারা (পত্রোপন্যাস), বোধন, শাত্-ইল-আরব, বাদল-প্রাতের শরাব, খেয়াপারের তরণী, বাদল-বরিষণে (গল্প), কারবানী, মোহররম, ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম, বিরহ-বিধূরা, মরমী ও স্নেহভীতু (গান), কামাল-পাশা, হাফিসের গজলের অনুবাদ প্রভৃতি নানা লেখা। এরপর ১৩২৮ সালে ২২ পৌষ তারিখে সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'। এই কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। পরাধীন ভারতের যুবশক্তির শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠল এই একটি কবিতায়। একমাসে দু'দুবার 'বিজলী' পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা পত্রিকাতেও কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হল। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যক্ষেত্রে প্রতির্ষ্ঠিত হলেন ঐতিহাসিক এই কবিতাটির হাত ধরে।

এরপর নজরুলকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। হরেক লেখার অনুরোধে-উপরোধে সদাব্যস্ত তিনি। নানা ধরনের মানুষের আনাগোনা চলছে তাঁর কাছে। আবেগপূর্ণ নজরুলকে যথোচিত পরামর্শ দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকা পালন করে চলেছেন মুজফফর আহমদ। এমনই এক সময়ে (১৩২৭-এর শেষের দিকে) ৩২, কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে কুমিল্লার পুস্তক ব্যবসায়ী আলি আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের আলাপ হয়। খান সাহেব ব্যবসায়ের কাজে কলকাতায় এলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির দফতরেই উঠতেন। বারংবার আসা

যাওয়া সূত্রে নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। নজরুল খান-সাহেবের পাঠ্যপুস্তকের জন্য 'লিচুচোর' ও আরো কয়েকটি শিশুপ্রিয় কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

আলি আকবর খান ছিলেন চতুর ব্যবসায়ী। সরল, প্রাণবান ও প্রতিভাদৃপ্ত নজরুলকে নিজের পুস্তক ব্যবসায়ে কাজে লাগানোর অভিসন্ধি তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে তিনি নজরুলকে একটি প্রস্তাব দিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল কুমিল্লার দৌলতপুরে। তিনি নজরুলকে জানালেন দৌলতপুরে তাঁর বাড়িতে কবিকে অতিথি হিসেবে পেতে চান। নজরুল রাজি হলেন। ১৩২৭-এর চৈত্র মাসে আলি আকবর নজরুলকে নিয়ে দৌলতপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

কুমিল্লার শহরে পৌঁছে কান্দিরপাড়ে বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাড়িতে এসে উঠলেন আলি আকবর খান। বীরেন্দ্রকুমার ছিলেন গিরিবালা দেবীর দেবর তথা কুমিল্লার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ইনসপেকটর ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর পুত্র। বারীন্দ্র কুমার আলি আকবরের সহপাঠে ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। আলি আকবরের সূত্রে কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারের সাথে নজরুলের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত হল।

ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী বিরজাসুন্দরী দেবী ছিলেন স্নেহময়ী ও উচ্চভাবের রমণী। প্রথম পরিচয়েই নজরুলের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য হয়। নজরুল তাঁকে 'মা' সম্বোধন করেন। আমরা আগেই বলেছি, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমারের বাসায় গিরিবালা দেবী ও প্রমীলা এসে উঠেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এঁদের সঙ্গেও নজরুলের আলাপ-পরিচয় হয়। মাত্র কয়েকটি দিন নজরুল এখানে ছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এর মূলে অন্যতম একটি কারণ ছিল সেনগুপ্ত পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

বিরজাসুন্দরী দেবী ছিলেন বিদূষী। তিনি কবিতা লিখতেন। সে সময়ে গৃহবধূদের কবিতা লেখা বেশ একটা উল্লেখ করার মতো ব্যাপার ছিল। কারণ মেয়েদের চারুকলার অনুশীলন সমাজ ভালো চোখে দেখত না। তাই তৎকালীন সামাজিক পরিকাঠামোয় বিরজাসুন্দরী দেবীর সাহিত্যসেবা নিশ্চয়ই তাৎপর্যজনক। তাঁর একটি কবিতা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেওয়া যাক্। যে কবিতাটি আমরা এখানে হাজির করছি সেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় (২৭ জানুয়ারি, ১৩২৯)। কবিতাটির নাম শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলাম। এর কয়েকটি পঙক্তি এইরকম–

ওরে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে
আমার এ বেদনাভরা বুকের মাঝে
জাগিয়ে দিলি নতুন ব্যথা
মা, মা, বলে কাছে এসে
আবার কবে কইবি কথা।
একি শুনি! গেছিস নাকি
শিকল দেবীর পূজায় চলে।
অশ্রুতো নয় আশীষ ধারা
অবিরত পড়বে রে তোর শিরে,
শঙ্কা কিসের! যাও তবে যাও
অলক্ষ্মণের বিজয় টীকা পরে।
হেথা বাজুক তোমার অগ্নিবীণা
আগুন টুটুক সুরে

মায়ের আশীষ বর্মসম
রক্ষা করুক তোরে।

বিরজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক ছিল মাতা-পুত্রে মতোই (পরবর্তী সময়ে বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলের 'খুড়ি-শাশুড়ি' হয়েছিলেন)। তাঁর স্নেহ-মমতা কবিকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২) 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি উদ্দীপনাময় ব্রিটিশ বিরোধী কবিতা লেখায় সরকার তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং একটি বিচার-প্রহসনের মধ্যে দিয়ে ঐ বছরের পৌষ মাসে (২৩ জানুয়ারি, ১৯২৩) তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সেন। লক্ষ্যনীয়, বিরজাসুন্দরী দেবীর লেখাটি কবির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তির পাঁচ দিনের মাথায় প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতায় বিরজাসুন্দরী দেবীর সাহসিকতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং মাতৃহৃদয়ের বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতাটি থেকে নজরুল নিশ্চয়ই প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। পরবর্তী সময়ে 'সর্বহারা' কাব্যটি (২৫ অক্টোবর, ১৯২৬) তিনি বিরজাসুন্দরী দেবীর নামে উৎসর্গ করে 'সর্বংসহা সর্বহারা জননী আমার' শব্দবন্ধটি লিপিবদ্ধ করেন। হুগলি জেলে দীর্ঘ ৩৯ দিন অনশন পর বিরজাসুন্দরীর হাতেই ফলের রস খেয়ে তিনি অনশন ভঙ্গ করেছিলেন।

এসকল ঘটনা বেশ খানিকটা পরবর্তী পর্যায়ের। তথাপি কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারের বিশিষ্টতা বোঝাতে গিয়ে এগুলি উল্লেখ করা হল। বিরজাসুন্দরী দেবীর পাশাপাশি তাঁর বড়ো জা গিরিবালা দেবীও ছিলেন স্বকীয়তায় ভাস্বর। তাঁর অসামান্য ধৈর্যগুণ ও স্থিরবুদ্ধির কথা আগে উল্লেখ করেছি। আরো উল্লেখ্য এই যে, তিনি ছিলেন রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ও স্থিতপ্রজ্ঞা। তিনি ভালো গান গাইতে পারতেন। কিন্তু আদ্যন্ত গোপন-স্বভাবা হওয়ায় তাঁর গুণাবলী সহজে

টের পাওয়া যেত না। তাঁর সঙ্গে যাঁরা গভীরভাবে মিশেছেন তাঁরাই তাঁর অনন্যসাধারণ গুণাবলি ও অসাধারণ হৃদয়-ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছেন।

ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের কথাও উল্লেখ করা দরকার। তিনি ছিলেন গৃহকর্তা। তাঁর ঔদার্যই পরিবারটিকে এমন পরিকাঠামো দিতে পেরেছিল। তাঁর পরিবার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কোন ঠাঁই ছিল না। তাই নজরুল এই পরিবারের সঙ্গে পরবর্তীকালে একাত্ম হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

এছাড়াও সেনগুপ্ত পরিবারের সভ্যসভ্যাগণের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, আশালতা, বীরেন্দ্রকুমারের আপন বোন কমলা (বাচ্চি) ও অঞ্জলি (জটু), বীরেন্দ্রবাবুর ছেলে রাখাল প্রমুখ ছিলেন ভাবের কাণ্ডারি। সাহিত্য-সঙ্গীত-রাজনীতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ চর্চায় কান্দিরপাড়ের সেনগুপ্ত বাড়ি সর্বদা গমগম করত। প্রাণবন্ত নজরুলের সঙ্গে এঁদের সখ্য তাই জমে উঠেছিল।

আলি আকবেরে সাহচর্যে সেনগুপ্ত পরিবারে যে চার-পাঁচদিন নজরুল রইলেন, সেই স্বল্প-সময়ের মধ্যেই তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। কবি হিসাবে তিনি তখনই খ্যাতিমান। তাঁর সুগঠিত শরীর, আয়ত চক্ষু, মধুর ব্যবহারের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বয়স নির্বিশেষে সকলেই মুগ্ধ। কান্দিরপাড়ে সেনগুপ্ত বাড়ি নজরুলের আগমনে কয়েকদিনের জন্য মেতে উঠেছিল। গানে, কবিতায়, হৈ-হুল্লোড়ে প্রাণবন্ত নজরুল উদ্দীপ্ত করে রেখেছিলেন সকলকেই। সেনগুপ্ত পরিবারও দু-হাত বাড়িয়ে আপন করে নিয়েছিলেন দামাল কবিকে।

দেখতে দেখতে স্বল্প কয়েকদিনের অবস্থান শেষ হল। আলি আকবর খান নজরুলকে নিয়ে চললেন দৌলতপুরে তাঁদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। সময় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস।

(৫)

দৌলতপুর ভারি সুন্দর জায়গা। কুমিল্লা থেকে বেশি দূর নয়। গ্রামীণ পরিবেশ মনের মধ্যে গড়ে তোলে বিধূর আবহ। নজরুলের কবিপ্রাণ সহজেই আকৃষ্ট হল দৌলতপুরের পরিবেশে। আলি আকবরের বিশাল বাড়িটিও ছিল বেশ সুন্দর।

দৌলতপুরে আলি আকবরের এক দিদি ছিলেন। তিনি প্রায়-প্রতিবেশী হয়ে খান-বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন। তাঁর নাম আসমাতউন্নেসা। তাঁর স্বামী অর্থাৎ আলি আকবরের ভগ্নীপতির নাম ছিল মুন্সী আব্দুল খালেক। এঁদের একটি বিবাহযোগ্য কন্যা ছিল। কন্যাটির নাম দুবরাজ বা সৈয়দা খাতুন। সৈয়দা ছিলেন রীতিমতো সুন্দরী। আসমাতউন্নেসা সৈয়দাকে নিয়ে প্রায়ই আলি আকবরের বাড়ি আসতেন।

আলি আকবরের বাড়িতে তাঁর আর এক বিধবা দিদি থাকতেন। তিনি ছিলেন আলি সাহেবের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী। এঁর নাম এখ তারউন্নেসা। (নজরুলকে পেয়ে তিনি মায়ের মতো সেবাযত্ন করতে থাকেন)। নজরুলও গানে-গল্পে মেতে ওঠেন। সৈয়দা তাঁর মায়ের সঙ্গে এসে এই সাংস্কৃতিক সভায় যোগ দিতেন। ক্রমে নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। নজরুলের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তিনি আত্মবিহ্বল হয়ে পড়েন। নজরুল ক্রমশ মোহগ্রস্ত হতে থাকেন। তাঁর কবিপ্রাণ, দৌলতপুরের সামগ্রিক আবহ, সৈয়দার আকর্ষণ-সব মিলেমিশে হঠাৎ কেমন

ওলটপালট ঘটে গেল তাঁর ছন্নছাড়া জীবন। আলি আকবর খুব খুশি হলেন। তিনি এমনটিই চেয়েছিলেন। সৈয়দার কাছে নজরুলকে বেঁধে দেওয়া গেলে প্রতিভাবান কবিকে নানাভাবে ব্যবহার করতে তাঁর পক্ষে কোন অসুবিধাই হবে না। মুজফফর আহমদ কিন্তু আলি আকবরের স্বভাব-প্রকৃতি জানতেন। নজরুল তাঁর সঙ্গে মাখামাখি করুন, এটা তিনি চাননি। কিন্তু সরল-হৃদয় নজরুল আলি আকবরের ফন্দি-ফিকির কিছুই বুঝতে পারেননি। যখন পারলেন তখন ঘটনার গতি বহুদূর বিস্তৃত। সৈয়দাকে ভালবেসে নজরুল তাঁর নামকরণ করেছিলেন নার্গিস। গানে ও কবিতায় তিনি ভেসে চলেছেন অনির্বচনীয় এক আনন্দলোকে।

১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে (১৮ জুন, ১৯২১) নজরুল-নার্গিসের বিবাহের দিন স্থির হয়। পাত্রীপক্ষের দিক থেকে খুব তাড়াহুড়ো করে বিবাহ-অনুষ্ঠানটি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা চলতে থাকে। মাত্র দু-মাসের পরিচয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসার ব্যাপারটা নজরুলের শুভাকাংখীরা অনেকেই পছন্দ করেননি। বিশেষত মুজফফর আহমদ এর মধ্যে বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে নজরুলও আলি আকবরের গোটা পরিকল্পনাটি ধরে ফেলেন। তিনি মুক্তি পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হন। এ কাজে বিরজাসুন্দরী দেবী যথেষ্ট সাহায্য করেন।

বিরজাসুন্দরী দেবী তাঁর পরিবারের নয়-জনকে নিয়ে ২রা আষাঢ় তারিখেই দৌলতপুরে এসে পৌঁছান। নজরুল তাঁকে বিবাহ-সম্পর্কিত জটিলতা ও সন্দেহাদির কথা বলেন। বিরজাসুন্দরী তাঁকে এ বিবাহ করতে নিষেধ করলেন। মুজফফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে (কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা) জানিয়েছেন ‘আকদ’ বা বিবাহ-চুক্তি না

করেই নজরুল বিয়ের মজলিশ থেকে উঠে গিয়েছিলেন। কল্পতরু সেনগুপ্ত এই ঘটনাটির বর্ণনা করেছেন এইভাবেঃ

"শেষ পর্যন্ত এই বিয়ে হয়নি, আসরে বসেও বরকে উঠে আসতে হয়। নজরুল ইসলাম অপমানিত ও প্রতারিত বোধ করেন। বিয়ে সম্পর্কে আগেই তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। ওই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। বিয়ের আসরে অতিথি অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে যখন প্রথা অনুযায়ী চুক্তিপত্র পড়ে শোনানো হলো– বিয়ের পরে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর পত্নী সৈয়দা বা নার্গিস আসার খানমকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না, দৌলতপুর গ্রামে তাঁর সঙ্গে বাস করবেন– এই অপমানজনক শর্ত শোনার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের পৌরুষ বিদ্রোহ করে উঠলো। তিনি বিয়ের আসর ছেড়ে চলে এলেন। বিয়েতে বিরজাসুন্দরী দেবীদের পরিবারের সকলে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীর লিখিত প্রতিবেদনে প্রকাশ ' বিয়ে তখন ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলতে লাগলো"। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ নজরুল রাতের অন্ধকারে কুমিল্লা পথে রওনা দিলেন। বিরজাসুন্দরী দেবী তাঁর ছেলে বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিলেন। কারণ নজরুল পথ চিনতেন না। তাঁর ওপর বর্ষার দিনে কাদাময় রাস্তা। আর নজরুলকে যেতে বারণ করলেও শুনবেন না। রাত্রির আঁধারে জলকাদা ভেঙে এগারো মাইল পথ হেঁটে তাঁরা কুমিল্লা শহরে পৌঁছলেন। নজরুল তখন মনের দিক থেকে ও স্বাস্থ্যে একেবারে ভেঙে পড়েছেন।'

এইভাবেই নজরুল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো। ঘটনার জেরে নজরুল কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারের আরো কাছাকাছি চলে এলেন। ফলে আমরা তাঁর নামের সাথে চিরস্থায়ী বন্ধনে যুক্ত হয়ে আশালতা বা প্রমীলাকে পেলাম। নজরুল–জীবনের গতিপ্রবাহও অন্য দিকে মোড় নিল।

(৬)

দৌলতপুর থেকে নজরুল কুমিল্লায় ৪ঠা আষাঢ়, ১৩২৮ বা ১৯২১ সালের ১৯ জুন তারিখে, ভোরবেলায় আর মুজফফর আহমদের সঙ্গে কুমিল্লা ত্যাগ করলেন ২২ শে আষাঢ় ১৩২৮ বা ৮ জুলাই ১৯২১ তারিখে। অর্থাৎ ১৯ দিন কান্দিরপাড়ে তাঁর দ্বিতীয় অবস্থান। এই সময়ে সেনগুপ্ত পরিবারের মানুষজনের আন্তরিক স্নেহযত্ন ও ভালোবাসায় নজরুলের হৃদয়-ক্ষত দ্রুত নিরাময় হয়। সকল দুঃখ ভুলে তিনি পুনরায় তিক্ত স্মৃতির সমাধি ছেড়ে তিনি উঠে আসেন জীবনের রাজপথে। কল্যাণময়ী প্রেমের অস্ফুট আভাসেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদল হয়। সাহিত্যে নতুন সুরপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়।

কিশোরী আশালতা বা নজরুলের পরমপ্রিয় চম্পকলতিকার অনাহত চক্রে নিহিত প্রেমের পবিত্রতায় ভাস্বর হয় নজরুলের লেখনী। এরকম একটি রচনার কথা উল্লেখ করা যাকঃ

সেই মিঠে সুরে মধুর বাঁশরী বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে।।
মনে পড়ে যায় সহসা কখন্
জলে-ভরা দুটি ডাগর নয়ন,
পিঠ-ভরা চুল, সেই চাঁপা ফুল
ফেলে ছুটে-যাওয়া লাজে।।
হারানো সে দিন পাবনা গো আর ফিরে,
দেখিতে পাব না আর সেই কিশোরীরে।
তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন

আমি ভুলিয়াছি, ভোলেনি সে যেন
গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে
(সে) আজও পথ চাহে সাঁঝে।

নজরুলের জীবন ও সাহিত্যে গোমতী নদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রেমময়তার অসাধারণ স্ফূরণ ঘটেছিল গোমতীর তীরেই। শেক্সপীয়রের জীবনে যেমন এ্যাভন, রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ে যেমন পদ্মা, কুমুদরঞ্জনের অজয়, নজরুলের জীবনে গোমতী তেমনই। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে লেখা কবিতগুলিতে নজরুলের প্রেম অসাধারণ ভাব-মাধুর্যে ভাস্বর। 'দোলনচাঁপা (অক্টোবর ১৯২৩) এবং 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে সে স্বাক্ষর আছে। 'দোলনচাঁপা' কাব্যের 'পূজারিনী' কবিতায় আমরা পাই-

তবু তব চেনা-কণ্ঠে মম কণ্ঠ সুর
রেখে আমি চ'লে গেনু কবে কোন্ পল্লী পথে দূর
দুদিন না যেতে একি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা গন্ধ নাভিপদ্মমূলে।

এই পঙক্তিগুলি আশালতা তথা প্রমীলাকে উদ্দেশ্য করে লেখা এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে একথা বলা যায়, মৃগ যেমন তার নাভিগন্ধে আকুল হয়ে চতুর্দিকে সেই গন্ধবিধূরতা সন্ধান করেন, নজরুলের হৃদয়ের অনন্ত প্রেমসুধাও অমৃতময়ী নারীর সঙ্গ-সাহচর্যে সেই নাভিগন্ধকেই খুঁজে ফিরেছে। নার্গিসের কাছে আহত হয়ে ফিরে আসার পর আশালতাই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর একমাত্র অবলম্বন। নিচের পঙক্তিগুলিতে সে কথা স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে প্রকাশিতঃ

কাঁটা-বেঁধা রক্ত মাখা প্রাণ নিয়ে এনু তব পুরে,

জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়
তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে।

আমার ধারণা কান্দিরপাড়ে প্রথম অবস্থানকালেই কিশোর আশালতার পরিণত হৃদয়ানুভবে নজরুল ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। নজরুলের দিক থেকেও সে ব্যাপারে সায় ছিল। কিন্তু দৌলতপুরের ঝোড়ো ঘটনায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ঝড় যখন থামল নজরুল ফিরে এলেন কান্দিপাড়ে এবং উপলব্ধি করলেন তাঁর কাঁটা-বেঁধা, রক্ত-মাখা, ব্যথাহত প্রাণের জন্য আশালতার সহমর্মিতা প্রেমেরই সমার্থক। তাই তিনি বলেছেন-

তবু কেন কতবার মনে যেন হত
তব স্নিগ্ধ মদির পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা, সব দগ্ধ ক্ষত।
মনে হত প্রাণ তব প্রাণে যেন কাঁদে অহরহ-
'হে পথিক, ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে
কহ মোরে কহ।

'তব স্নিগ্ধ মদির পরশ' বলতে কল্যাণময়ী প্রমীলা বা আশালতার অমেয় ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর কাঁটাটি হল কবির বাল্য বয়সের প্রাণপ্রিয়ার সেই কাঁটা যা সদর্থক প্রেরণা দিলেও দৌলতপুর পর্বে কবির হৃদয়পদ্ম রক্তাক্ত করে দিয়েছিল।

কান্দিরপাড়ে স্বল্পদিনের অবস্থান কাটিয়ে নজরুল কলকাতায় ফিরলেন। আশালতার কিশোরী বুকে জেগে রইল গোপন প্রেমের পবিত্র কুসুম। কবি লিখেছেন-

নীরব গোপন তুমি, মৌন তাপসিনী
তাই তব চির-মৌন ভাষা
শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা-বুকে
কাঁদে কত ভালোবাসা আশা।

নজরুলের তৃতীয়বার কান্দিপাড়ে আসেন ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (নভেম্বর, ১৯২১ খ্রিঃ)। এই সময় তিনি মাসাধিককাল সেনগুপ্ত বাড়িতে ছিলেন। এই সময় সেনগুপ্ত বাড়ির রাজনৈতিক পরিবেশের অনুকূলতায় তিনি জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান ও কবিতা লিখতে থাকেন। 'গুলিস্তাঁ' পত্রিকার নজরুল-সংখ্যায় আফতাব-উল-ইসলাম জানিয়েছেন, ('১৯২১ সনে শ্রীযুক্ত বীরেন সেন' কাজীর এবং আমাদের সকলের 'রাঙা দা') তখন কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কাজী নজরুল কান্দিরপাড়ে তাঁরই বাড়ীতে থাকেন। প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে কংগ্রেস-ঘোষিত হরতাল পালনের জন্য (২১ শে নভেম্বর) একটি গান লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়েই প্রথম তাঁর সাথে দেখা করি 'রাঙা দা'-র বাড়ীতে। তিনি তো তা দিলেনই অধিকন্তু কাঁধে হারমোনিয়াম বেঁধে মিছিলের সঙ্গে তিনি নিজেও গাইলেন।

'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও,
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।'

অনুমান করা অসংগত হবে না, কান্দিরপাড়ে তৃতীয় অবস্থানকালে নজরুল-আশালতার মধ্যে ভালোবাসা দানা বেঁধেছিল।

এই ভালোবাসা কল্যাণকর ছিল এই কারণে যে, তা জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতি করেনি। বরং আশালতার ভালোবাসা তাঁকে গণমানুষের কাজে, দেশের মুক্তিসংগ্রামের পথে আরো বেশি বেশি ঠেলে দিয়েছিল। এখানেই আশালতা তথা প্রমীলার প্রেমের স্বার্থকতা। নার্গিসের প্রেম নজরুলকে মোহময়ী নারীর স্বরুপ উদঘাটনে কাব্যময় করেছিল, কিন্তু আশালতার প্রেম তাঁকে মানবকল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

চতুর্থবার নজরুল, কান্দিরপাড়ে আসেন মাঘ, ১৩২৮ বঃ (ফ্রেব্রুয়ারি ১৯২২ খ্রিঃ)। এই পর্যায়ে তিনি চার মাস (মাঘ ১৩২৮ বৈশাখ- ১৩২৯ ফ্রেব্রুয়ারি-মে, ১৩২২) এখানে ছিলেন। এই সময়কালে নজরুল-আশালতার প্রেম প্রকাশ্যে চলে আসে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, নজরুল-আশালতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। সেনগুপ্ত পরিবার প্রগতিশীল ভাবনার শরিক হওয়া সত্ত্বেও এই প্রেম মেনে নিতে পারলেন না। গিরিবালা দেবী এই পরিস্থিতিতে কান্দিরপাড়ে ত্যাগ করে তাঁর মেয়েকে নিয়ে বিহারের সমস্তিপুরে তাঁর পিত্রালয়ে চলে যান।

এই ঘটনা নজরুলকে নিদারুণ আহত করে। বিশেষত বিরজাসুন্দরী দেবীর কাছে তিনি উদারতা আশা করেছিলেন। আলাপের পর থেকে দৌলতপুর পর্ব এবং পুনরায় কান্দিরপাড় আগমন পর্যন্ত মাতৃসমা বিরজাদেবী তাঁকে নানাভাবে রক্ষা করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষরও নজরুল 'পূজারিনী' কবিতায় রেখেছেন –

এরি মাঝে কোথা হতে ভেসে এল মুক্তধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে,
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পারে
কোথা গেল পথ –

কোথা গেল রথ –
ডুবে গেল সব শোক–জ্বালা
জননীর ভালবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দোলাইল দেয়ালীর আলা
গত–কথা গত জন্ম হেন
হারা–মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেনু যেন।
গৃহহারা গৃহ পেনু, অতি শান্ত মুখে
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভরে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে।
শেষ হ'ল পথ–গান–গাওয়া।
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হা–হা স্বরে পথসাথী তুফানের হাওয়া।

বিরজাসুন্দরী যে শতকরা একশোভাগই নজরুলের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির যোগ্য ছিলেন সে–বিষয়ে সন্দেহ নেই। সামাজিক সংস্কারের বশীভূত হয়ে ও সমাজের চাপে সাময়িকভাবে তিনি রক্ষণশীলতার শিকার হয়েছিলেন। পরে সে সংস্কার তিনি কাটিয়ে ওঠেন। যাই হোক্, নজরুল–আশালতার প্রেম নিয়ে সেনগুপ্ত পরিবারে এমনই ঝড় ওঠে যে, গিরিবালা দেবী কান্দিরপাড়ের বাসা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

এদিকে নজরুলও কয়েকটি ঘটনায় পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন। ১৩২৯ সালের ২৬ শে শ্রাবণ (২২ আগস্ট, ১৯২২) তাঁর সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সপ্তাহে দুবার প্রকাশের প্রতিশ্রুতিও থাকে। ৩২, কলেজ স্ট্রিটে আফজাল–উল হক সাহেবের ঘরে প্রথম দফতর বসে, পরে (সপ্তম সংখ্যা প্রকাশের পর) দফতরটি উঠে যায় প্রতাপ চাটুয্যে লেনে। 'ধূমকেতু' ছিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের স্বপক্ষে এক জোরালো কণ্ঠস্বর। এই পত্রিকায় নজরুলের ধূমকেতু, মহররম, আমি সৈনিক, ভিক্ষা দাও প্রভৃতি জ্বালাময়ী কবিতা আত্মপ্রকাশ করে।

'ধূমকেতু' পত্রিকার পূজো সংখ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২) নজরুলের লেখা 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কশাঘাত হানেন। ব্রিটিশ সরকারও প্রত্যাঘাত হানতে ছাড়লেন না। ধূমকেতুর এই কবিতাটি বাজেয়াপ্ত হল। পুলিশ খুঁজতে লাগল বিদ্রোহী কবিকে।

নজরুল কলকাতাতেই গা ঢাকা দিলেন। ৩২, কলেজ স্ট্রিট ও ৭, প্রতাপ চাটুয্যে স্ট্রিটে কিছুদিন রইলেন। ধূমকেতুর দেওয়ালি সংখ্যা বের হল। তাতে নজরুলের 'ম্যায় ভুখা হু' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেওয়ালি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। নজরুলও ফেরার হয়ে গেলেন।

কয়েক মাস কেটে গেল। আত্মগোপন পর্বে নজরুল একসময় সমস্তিপুর গেলেন। তখন তাঁর মামাশশুরের বাড়িতে গিরিবালা মেয়েকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নজরুল কুমিল্লার পথে পাড়ি দিলেন। (কিন্তু ১৩২৯ বঙ্গাব্দের অঘ্রান মাসের গোড়ার দিকে কুমিল্লা থেকে বিদ্রোহী কবিকে গ্রেফতার করে কলকাতায় (২৪ নভেম্বর, ১৯২২) আনা হল। অতর্কিত হানায় কবিকে কোর্টে হাজির করা হল। মোকদ্দমার দিন ধার্য হল। ১৩ই অঘ্রান। বিচারক ছিলেন কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো। কয়েক মাস বিচারের নামে প্রহসন চলল। অবশেষে ২রা মাঘ ১৩২৯ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারায় রাজদ্রোহিতার অপরাধে(!) নজরুলের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

নজরুল প্রথমে কয়েকমাস বিশেষ কয়েদী হিসেবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। তারপর, কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁকে

‘সাধারণ’ শ্রেণিভুক্ত করে হুগলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নজরুল ছিলেন প্রায় তিন মাস (১৬ জানুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল)। হুগলি জেলে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ দু’মাস চারদিন(১৪ এপ্রিল থেকে ১৮ জুন, ১৯২৩)। হুগলি জেলের কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা চেয়ে নজরুল ও আরও কয়েকজন কয়েদী এক ঐতিহাসিক আন্দোলনে নামেন। নজরুল হুগলি জেলে এসেছিলেন ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ। বর্ষবরণের দিনই শুরু হল অনশন। বন্দীদের ওপর জেল-কর্তৃপক্ষ নামিয়ে আনলেন নৃসংশ অত্যাচার। কিন্তু নজরুল ও তাঁর বন্ধুদের দমানো যায়নি। টানা ঊনচল্লিশ দিন অনশন চলে। আটত্রিশ দিনের মাথায় (২১ মে ১৯২৩) কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্ব একটি মহতী সভা হয়। সেই সভায় নজরুল ও অন্যান্য অনশনকারীদের (গোপালচন্দ্র সেন, মৌলবী সিরাজুদ্দীন প্রমুখ) অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে পরের দিন (২২ মে ১৯২৩) ডা. আবদুল্লাহ্ সুহরাওয়ার্দি, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ আলি ও মৌলবী ওমেদ আলি হুগলি জেলে যান এবং অনশনকারীদের অনশন ভাঙতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধে নজরুল ও তাঁর সহকর্মীরা কিছুটা নরম হন। এর পরের দিন অর্থাৎ ২৩ মে ১৯২৩ বা ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে ফলের রস খেয়ে অনশন ভাঙেন।

এই ঘটনার পর নজরুল আরও পঁচিশ দিন হুগলি জেলে ছিলেন। এই সময়কালে কর্তৃপক্ষ বন্দীদের অনেকগুলি দাবী মেনে নেন। কিন্তু নজরুল অপরিহর প্রভাবে ভিত হয়ে তারা তাঁকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করেন। বহরমপুর জেলে নজরুল ছিলেন ৯ মাস ৯ দিন।

কারণ সাজা মুকুম হওযায় তিনি ২৯ মাঘ, ১৩৩০ (১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৩) মুক্তি পান।

বহরমপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নজরুল বহরমপুর শহরে তাঁর বন্ধু নলীনাক্ষ সরকারের বাড়ি কিছুদিন ছিলেন। নলীনাক্ষবাবুর সূত্রে গোবরডাঙার ঘটক পরিবারে সুবিখ্যাত জগৎ ঘটক ও নিতাই ঘটক-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ঘটক বাড়িতে তিনি কিছুদিন থাকেন ও আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। এরপর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য মেদিনীপুর যান (১১ ফাল্গুন, ১৩৩০)। সেখানে চারদিন থাকেন। 'ভাঙার গান' মেদিনীপুরবাসীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং গানে-কবিতায় মেদিনীপুর জেলার সংগ্রামী মানুষদের মাতিয়ে দিয়ে আসেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, দীর্ঘ কারাবাসের অসম্য শক্তি ও প্রাণবন্ত উন্মাদনা নজরুল কোথায় পেলেন। এ শক্তি অবশ্যই তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল। বিপ্লবী বন্ধু ও নেতৃবর্গের সঙ্গে-সাহচর্য অসম্য দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ তাঁকে অসাধারণ সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিল। পাশাপাশি কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারও তাঁকে সদর্থক প্রেরণা দান করেছিল। নজরুলের কারাগারের বন্ধু নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'কাজীর প্রয়োপবেশনের সংবাদ পাবার পরমূহূর্ত থেকে বিরজাসুন্দরী আহার্য পরিত্যাগ করেছিলেন। উপবাসে দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেই দেহটাকে টেনে নিয়ে তিনি ছুঁটে এসেছিলেন হুগলি জেলের দ্বারে। কতখানি হৃদয়সংযোগ থাকলে এমন সহমর্মিতা সম্ভব তা আমরা অনুমান করতে পারি। কিশোরী আশালতার পক্ষে নজরুলকে প্রত্যক্ষ প্রেরণা দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। সে সময় মেয়েদের তেমন স্বাধীনতাও ছিল না। কিন্তু তিনি যে বিদ্রোহী কবির মানসলোকে নিরব

ও অতন্দ্র প্রেরণা দান করেছিলেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। হুগলি জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় নজরুল 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থটি লিখেছেন। আমরা সকলেই জানি, এই কাব্যগ্রন্থটি কবি তার প্রিয়তমা দুলি বা দোলন (আশালত/প্রমীলা)-কে কেন্দ্র করেই লিখেছিলেন। আশালতা তথা প্রমীলার কল্যাণদায়ী প্রেম এভাবেই কারাজীবন পর্বে নজরুলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ রেখেছিল এবং সদর্থক ও গণকল্যাণকর চিরন্তন কাব্য প্রয়াসে সুস্থিত করে রেখেছিল। তাই নজরুলের ঐতিহাসিক কাণ্ডকর্মের অন্তরালে শক্তিরূপে প্রমীলার অস্তিত্ব তথা অবদানের কথা আমাদের ভুললে চলবে না।

(৭)

১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসের গোড়ায় নজরুল সমস্তিপুর গেলেন। তিনি মনস্থির করেই গিয়েছিলেন। জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন, আশালতার প্রেমই তাঁকে কল্যাণের পথে স্থিত করতে পারবে। তাই আশালতাকে সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে তিনি মা-মেয়েকে (গিরিবালা দেবী ও তাঁর কন্যা আশালতা সেনগুপ্তা) সঙ্গে করে কলকাতার অদূরে হাওড়া জেলার বালিতে এসে ওঠেন। সেখানে ডা. অবনী চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন থাকার পর তিনি কলকাতায় ৬ নং হাজি লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নেন। এই বাড়িতেই ১৩৩১ সালের ১২ই বৈশাখ (২৫ এপ্রিল, ১৯২৪), শুক্রবার, নজরুল প্রমীলার বিবাহ হয়।

বিবাহের সময় নজরুলের বয়স ছিল পঁচিশ, প্রমীলার (এরপর থেকে আমরা আশালতাকে প্রধানত প্রমীলা নামেই লিখব) ষোল, বিষয়ে স্থির হয়েছিল পাত্র-পাত্রীর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এবং গিরিবালা দেবীর নৈতিক সমর্থনে। বিবাহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন মিসেস এম. রহমান। ইনি ছিলেন শ্রীরামপুরের সাব-রেজিস্ট্রার কাজী মাহমুদ-উর-রহমানের পত্নী। এঁর পিতা ছিলেন হুগলি সরকারি উকিল খান বাহাদুর মজহারুল আন্‌ওয়ার সাহেব। শ্রীমতী রহমান ছিলেন বিদূষী রমণী। তিনি 'মা ও মেয়ে' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। নজরুলকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। নজরুল যখন বহরমপুরে জেলে সে সময় ইনি কবিকে চিঠিপত্র লিখতেন। মাঝে-মধ্যে সুস্বাদু খাবারও পাঠাতেন। কবি তাঁর 'বিষের বাঁশী' (শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪) কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীমতী রহমানকে। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেনঃ "বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম কুল-গৌরব আমার জগৎজননী-স্বরুপা 'মা' মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে"।

শ্রীমতী রহমানের সক্রিয় উদ্যোগে এবং অর্থানুকুল্যে প্রমীলা-নজরুলের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহে কাজী, উকিল, ও সাক্ষীদ্বয় ছিলেন যথাক্রমে মঈনদ্দীন হোসায়ন (পূব লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী) আব্দুল সালাম, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি ও খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন। বিয়ের সময় বরবেশী নজরুল সাদা চাদর দিয়ে পাগড়ি তৈরী করে মাথায় পরেছিলেন।

নজরুল ও প্রমীলার ঐতিহাসিক এই বিবাহ হয়েছিল 'আহলে-কিতাব' মতে। প্রমীলার বয়স আঠারো না হওয়ায় সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট বা তিন নম্বর আইনে (১৮৭২) এই বিবাহ সম্ভব ছিল না। তাছাড়া পাত্র-পাত্রী উভয়েই স্থির করেছিলেন কেউই ধর্মান্তরিত হবেন

না। আহলে কিতাব বা আহলুল কিতাব মতে বিবাহ হলে পাত্র-পাত্রী উভয়েই নিজের নিজের ধর্ম বজায় রাখতে পারবেন ও পছন্দ মাফিক ধর্মাচরণ করতে পারবেন। তাই নজরুল ও প্রমীলা এই মতেই বিবাহ স্থির করেছিলেন।

কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ মানবতাবাদী ও উদার এই বিবাহ বন্ধন মিলে নিতে পারেননি। হিন্দুদের একটা অংশ চটে গেল বিয়েটা মুসলমানী মতে হয়েছে বলে (আলহে কিতাব বা কিতাব ওয়ালা), মৌলবাদী মুসলমানেরা চটলেন পাত্রীর ধর্মান্তকরণ না হওয়ায়। এমনকী ব্রাহ্মণরাও (তাদের কাছের উদারতা আশা করা গিয়েছিল) বিরোধিতায় নামলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় নজরুলের লেখা বন্ধ হয়ে গেল। তবে বিপ্লবী যুবক-যুবতীগণ এবং সমাজের প্রগতিশীল অংশ এই বিবাহ সমর্থন করেছিলেন। প্রমীলা-জননী গিরিবালা দেবী ও নজরুলের মাতৃসমা মিসেস এম. রহমান (মহম্মদ মাসুদা খাতুন)-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা পুনরায় উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। পাশাপাশি দুঃখের কথা এই যে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবী এই বিবাহ বয়কট করেছিলেন। পরিবেশগত কারণে বিবাহ অনুষ্ঠানটিও অনাড়ম্বর হয়েছিল।

নজরুল প্রমীলারা বিবাহের সময় রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে মুজফ্ফর আহমেদ কানপুর জেলে আটক ছিলেন। আব্দুল হালিমের চিঠিতে তিনি এ বিয়ের সংবাদ জেনেছিলেন। তাই তার পক্ষে নজরুলকে এবং তাঁর নবপরণীতা বধূকে প্রত্যক্ষ সাহায্য করার কোনো উপায় ছিল না। অথচ এ সময়ে নজরুল ও প্রমীলার নির্ভরযোগ্য একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল।

এই সময় হুগলির কংগ্রেস নেতা ভূপতি মজুমদার জেলে। হুগলির বিপ্লবী কর্মী হামিদূল হক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় নজরুল স্ত্রী ও শাশুড়িকে নিয়ে হুগলিতে আসেন। কিন্তু নজরুল পরিবারকে কেউ বাড়িভাড়া দিতে চান না। সমাজের জগদ্দল বিধান ও সংস্কার এমনই ভয়ঙ্কর যে, নজরুলের মতো জনপ্রিয় কবিকে একটা বাড়ি ভাড়া পেতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। আশার কথা, হুগলির 'যুগান্তর দলে'র তরুণ বিপ্লবীরা সঙ্গ ও সাহায্য দিয়েছিলেন। এমনই একজন বিপ্লবী, দেশসেবক বীরেন ঘোষ তাঁর দাদা খগেন ঘোষের কাঠঘড়ার বাড়িতে নজরুল পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এখানেও কিছু অসুবিধা হতে থাকায় হামিদুল মোক্তারের পরিবারে নজরুলের থাকার ব্যবস্থা হয়। এই বাড়িতে নজরুল কিছুদিন স্থিত হন। বাড়িটি ছিল মোগলপুরা লেনে। হুগলির বিদ্যামন্দির (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি বিদ্যালয়) ও কংগ্রেস অফিসের উত্তরদিকের গা ঘেঁষে এই গলি। প্রগতিশীল রাজনীতির অনুষঙ্গে সে সময়ে হুগলির চুচুড়ার পরিবেশ বেশ অনুকূল ছিল। যুগান্তর দলের বিপ্লবী তরুণেরা কবিকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। এখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ও লেখার সুযোগ পান। রাজনীতির লোকজন ছাড়াও কলকাতা থেকে অরাজনৈতিক সাহিত্যিকের দল নজরুলের মোগল পুরার লেনে এসে প্রায়শই মজলিশ বসাতেন। গানে কবিতায় হুল্লোড়ে কবির বাসা সর্বদা গমগম করতো।

এই বাড়িটিই কার্যত প্রমীলার শ্বশুড়ালয় হয়ে ওঠে। সংসারটি ছোটো- নজরুল, প্রমীলা ও গিরিবালা। কিন্তু আদতে পরিবারে ঝক্কির অন্ত ছিল না। নজরুলের সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রায়ই আসা- যাওয়া করতেন। রাজনৈতিক বন্ধুরা এবং যুগান্তর দলের তরুণ কর্মীরাও অনবরত আসা-যাওয়া করতেন। গিরিবালা ও প্রমীলা অতিথিদের

দেখভাল করতেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও অতিথিদের আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি হতো না।

নজরুল পরিবারের সুস্থিতি গিরিবালা দেবীর জন্য বহুলাংশে সম্ভব হয়েছিল। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজের যাবতীয় ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে তিনি যে ভাবে মুসলমান জামাই ও নিজকন্যার তত্ত্বাবধান করেছেন তা বিস্ময়কর। 'মুসলমান' শব্দটি উচ্চারণ করছি বিশেষ একটা কারণে। হিন্দু সমাজ কোনোদিনই মুসলমান ভাই-বোনেদের আপন বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'হিন্দু মুসলমান পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।' এই ঘৃণার মনোভাব মুসলমান জনসমাজকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করেছে।

এমন একটি সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে এবং নিজের ধর্মাচরণ (হিন্দুশাস্ত্রসম্মত) সম্পূর্ণ বজায় রেখেও গিরিবালা পরম ধর্মসহিষ্ণুতা ও মানবতার যে পরিচয় দেখিয়েছেন তা ঐতিহাসিক। এটা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি নিজে, প্রমীলা এবং নজরুল- তিনজনেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানবাদের (আচার-বিচার-সংস্কার-পূজাপার্বন প্রভৃতি) চেয়ে ধর্মের ভেতরের সত্যকেই ('ধৃ' ধাতুজ- যা অন্যায় অসত্য প্রভৃতি থেকে সরিয়ে রাখে, রক্ষা করে, ধারণ করে) বেশি করে মানতেন। ধর্মকারার মোহে এরা বদ্ধ ছিলেন না। তাই নিজেরা যেমন

বাঁচতে শিখেছেন, ধর্মভিরু বাঙালি জাতিকেও সংস্কার ভেদ করে বাঁচতে শিখিয়েছেন।

গিরিবালা দেবীর জীবনকথা এমনই মহান, তা লিখতে গেলে একটি বই হয়ে যাবে। গিরিবালার কথা অনেকেই লিখেছেন। আমরা খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের লেখা 'যুগ-স্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিইঃ "নজরুল-সংসারের গৃহিনীপনায় তাঁর শাশুড়ির দান সীমাহীন। স্বীয় সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তখন যদি তিনি এই সংসারের ভার না নিতেন, তা হলে নজরুলের উচ্ছৃঙ্খল-জীবনের গতি কোন দিকে ফিরে যেতো, তা কেউ বলতে পারে না।

এই দৃঢ়চিত্ত মহিলা স্বহস্তে লাগাম ধরে অস্থিরমনা, লক্ষ্মীছাড়া, আইন-অমানা বিদ্রোহী নজরুলের জীবনকে কিছুটা স্বনিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন।

নজরুল শাশুড়িকে আমরা মাসীমা (নজরুলও প্রথমদিকে 'মাসীমা' ডাকতেন) বলে ডাকি। তিনি নিজেকে সাত্বিক জীবনযাপন করেন। হিন্দু বিধবার কঠোর নিয়ম পালন করেন। অথচ মুসলমান জামাতা নজরুলের সাংসারিক জীবনের সমস্ত তালই তাঁকে সামলাতে হয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাঁকে (কবি নজরুল) না দেখলে মন থাকতো চঞ্চল। হুগলী হয়েছিল যেন আমার তীর্থস্থান। মাসীমার সে কি আদর-আপ্যায়ন ! তাঁর হাতের নারকোল-চিংড়ি রান্নার স্বাদ এখনো আমি ভুলতে পারি না"। (পৃঃ ৫৪-৫৫)

আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও হুগলিতে প্রমীলার ঘর-সংসার বেশ সুখের হয়েছিল। তাঁর বাপের বাড়ির বাতাবরণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, নজরুলের কাছে এসে সে-উজ্জ্বলতার বহুগুণ অনুকূলতা তাঁর কিশোরী হৃদয় আপ্লুত করেছিল। নজরুল-প্রমীলা উভয় উভয়ের প্রেমে এমনই বিহ্বল ছিলেন যে, হুগলীর দিনগুলি সোনারং ঔজ্জ্বল্যে বিভূষিত হয়ে উঠল। নজরুলের আলোকসামান্য প্রেমিক-হৃদয় এবং প্রমীলার কিশোরী হৃদয়ের স্বর্ণপ্রভা মিলেমিশে সৃষ্টি হল এক অপূর্ব প্রেমগাথা। প্রমীলার লেখা একটি কবিতা থেকে সে প্রেমের সুধাস্পর্শ পাওয়া যায়।

কবিতাটি দ্বিমাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় ১৩৩২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটিই 'সওগাত' পত্রিকার মহিলা সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিতাটি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল-

শঙ্কিতা

কেন আজি প্রাণ মম বেদনায় বিহ্বল
কেন আজি অকারণ চোখে আসে জল।।
সন্ধ্যার সমীরণ হু হু করে বয়ে যায়
বয়ে যায় মোর মন করে কেন হায় হায় ।
কেন বেদনায় মম বুক আজি কম্পিত
কে জানেগো হিয়া মাঝে কত ব্যথা সঞ্চিত।।
বেলা শেষে নীলিমায় চেয়ে আছে অনিমিখ্।
কে ছড়ালে বিদায়ের সিন্দুর চারিদিক।
কিছুই বুঝিনা হায় কেন প্রাণ ভাবাতুর

কে দিলে হৃদয়ে বেঁধে মল্লার-রাগসুর।
মনে হয়, এ নিখিলে কেহ নাই, নাই মোর
তুমি বলো কি সন্ধ্যা, কেহ নাই, নাই তোর।।

সেনগুপ্ত পরিবারের সাহিত্যচর্চার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। বিরজাসুন্দরী দেবীর কবিতা লেখার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি বলা দরকার, প্রমীলা-জননী গিরিবালা দেবীও কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করেছেন। তিনি মূলত গল্প লিখতেন। তাঁর লেখা ছোটগল্প 'অলকা', 'ভ্রান্তি' এবং 'ঠিকভুল' নারায়ণ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তিনি খুব সুন্দর চিঠি লিখতেন। প্রমীলার সাহিত্যচর্চায় তাঁর প্রভাবও যে খুবই ছিল, একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রমীলাদেবীর কবিতাটি একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কবিতাটিতে ছন্দপটুতার পাশাপাশি হৃদয় মাধুর্য কাব্যমণ্ডিত হয়েছে। বারো পঙক্তির কবিতাটি খেলো হাতের রচনা নয়। 'কে ছড়ালো সিন্দুর চারিদিক' - এই পঙক্তি লিখতে গেলে কবজির জোর লাগে। 'কে দিলো হৃদয়ে বেঁধে মল্লার-রাগসুর, - পঙক্তিটিও বিশিষ্টতা দাবি করে। সর্বোপরি, কবিতাটিতে ব্যথাতুর হৃদয়ের নিজস্ব আর্তি ধরা পড়েছে।

১৩৩২-এর বৈশাখ মাসে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তার কিছু আগেই এটা লেখা হয়েছিল তা নিশ্চিত। সে-সময় প্রমীলার হৃদয় বিরহ-ব্যথায় ভারাতুর হওয়ার কথা নয়। কারণ নজরুলের সাথে নবপরিণয়ে জীবনের মাধুর্যে তিনি তখন ভরপুর। তবে এমন কবিতা তিনি লিখলেন কেন?

প্রমীলা দেবীর হৃদয়-নন্দনবনে গোপন ও পবিত্র প্রেমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নজরুলের অনন্যসাধারণ প্রেমময়তার কথাও

বারে বারেই বলা হচ্ছে। প্রমীলা-নজরুলের প্রেম ছিল বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমের মতোই ভাবঘন ও দার্শনিকতাসম্পৃক্ত। সপ্তদশী প্রমীলা সে প্রেমের মাধুর্যে এমনই আত্মমগ্ন ছিলেন যে, নিজের বৈষ্ণব-কবিতার নায়িকার সাথে একাত্ম করে তাঁর কবিতাটিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বৈষ্ণব কাব্যের নায়িকার 'অষ্ট'-রূপ যথাক্রমে এই রকম-

(ক) অভিসারিকাঃ প্রিয়তমের সাথে মিলনের জন্য ইনি সংকেতকুঞ্জের দিকে যাত্রা করেন।

(খ) বাসরসজ্জ্বাঃ মিলনের উদ্দেশ্যে ইনি নিজেকে সাজান এবং সংকেতকুঞ্জটিকেও সাজিয়ে তোলেন।

(গ) উৎকণ্ঠিতাঃ ইতি উৎসুক হৃদয়ে সংকেতকুঞ্জে নায়কের জন্য প্রতীক্ষা করেন

(ঘ) বিপ্রলব্ধাঃ ইনি নায়কের দ্বারা বঞ্চিতা বা প্রতারিতা

(ঙ) খণ্ডিতাঃ নায়ককে রাত্রিশেষে প্রতিনায়িকার ঘর থেকে ফিরতে দেখে ইনি রুষ্ট হন

(চ) কলহান্তরিতাঃ নায়ককে (শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে যিনি অভিমানাহতা

(ছ) প্রোষিতভর্তৃকাঃ নায়কের মথুরাগমনে বিরহিনী

(জ) স্বাধীনভর্তৃকাঃ নায়ককে ইনি নিজ অধিকারের মধ্যে লাভ করেন, খণ্ডমিলনের ব্যঞ্জনাও থাকে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে 'বিপ্রলম্ভ' নামক একপ্রকার শৃঙ্গার রসের উল্লেখ আছে। এই রস অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। বিপ্রলম্ভে মিলনের অভাবজনিত বেদনাবোধ থাকে। আমরা জানি, সাহিত্য বাস্তবের অনুকৃতি নয়, তা

হলে সর্বার্থে ব্যঞ্জনাময় মানসপ্রকাশ। প্রমীলা দেবী অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের কবি এমন দাবি করছি না, তবে তাঁর কবিতায় মিলনের মধ্যে দুঃখানুভবের রসোত্তীর্ণ ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতাটিতে 'উৎকণ্ঠিতা' রূপের প্রকাশও দেখতে পাই। কবিতাটির নামটিও (শঙ্কিতা) এই ভাবের অনুরূপ। বড়ো প্রেমের মধ্যে, মিলনসুখের মুহূর্তেও, বিচ্ছেদের তথা বিরহের যে শৈল্পিক সম্ভাবনা থাকে প্রমীলা দেবীর কবিতাটিতে আমরা তা পরিস্ফুট হতে দেখেছি।

তাঁর লেখা আরো একটি কবিতার কথা আমরা জানি। ১৩৩২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। নিচে পূর্ণ বয়ান দেওয়া হল–

করুণা

সেই ভালো তুমি যাও ফিরে যাও
মোর সুখনিশি হয়েছে ভোর
সেধে সেধে কেঁদে থাকি পায়ে বেঁধে
ভেঙ্গেছে সে ভুল ছিঁড়িনি ডোর।।
জনমের মতো ভুলে যাও মোরে
সহিব নীরবে যাও দূরে সরে
করুণা করিয়া দাঁড়ায়োনা দোরে
পাষাণ এ-হিয়া বাঁধিব গো।।
চিরদিন আমি থাকিব তোমার
কাঁদিবে বেহাগ কণ্ঠে আমার
আপনি একলা কত স্মৃতি হার
গাঁথিব ছিঁড়িব কাঁদিব গো।
প্রাণ নাহি চায় দায়ে ঠেকে আসা

একটু আদর কিছু ভালোবাসা
চাইনাকো আমি ঘুমের কুয়াশা
থাকুক জড়ায়ে নয়নে মোর।।
দোষ করে থাকি মোরে ক্ষম
সুখী হও তুমি প্রার্থনা মম
চাহিনাকো সুখ, ভিখারীর সম
সেই ভালো তুমি হও কঠোর।।

দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমান এখানে প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি দয়িতের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাও প্রকাশিত। 'চিরদিন আমি থাকিব তোমার'- নজরুলের প্রতি প্রমীলার অমেয় প্রেমের মহার্ঘবাণী। কোনো দোষ করে থাকলে দয়িতের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁকে কঠোর হতেও তিনি বলেছেন। এই পর্যায়ে 'কলহান্তরিতা'র অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। প্রমীলার পবিত্র প্রেমময়তার যথার্থ অনুভব এই কবিতাটির প্রতিটি শব্দের ছড়িয়ে আছে।

অপরদিকে প্রমীলার প্রতি নজরুলের প্রেম তাঁর একাধিক রচনায় পূজা-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এরকম অন্তত দুটি কবিতার কথা উল্লেখ করব। প্রথম কবিতাটি কবি বন্দিদশায় রচনা করেন। কবিতাটির মধ্যে দিয়ে তিনি আশালতার সাথে তাঁর প্রণয়-সম্পর্ক ঘোষণা করেছিলেন। কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল-

বিজয়িনী

হে মোর রাণী। তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে !
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।

আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ।।
ওগো জীবন-দেবী!
আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল !
আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল !
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী, নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ তোমার মালায় পরে
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।।

এই কবিতাটি 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাসে এই কাব্যগন্থটি প্রকাশ পায়। 'বিজয়িনী' অর্থাৎ আশালতা বা প্রমীলার কাছে নজরুল তাঁর হৃদয়ের অকলঙ্ক প্রেম নিবেদন করেছেন। তাঁর নিঃশর্ত প্রেমমঞ্জরী দয়িতাকে যেমন মহীয়সী করেছে, তিনি নিজেও তেমনই মহীয়ান হয়ে উঠেছেন। নজরুল-প্রমীলার মহৎ হৃদয়বেত্তার দুপারেই ফসলের ক্ষেত, চোরাবালির ঠাঁই নেই কোথাও। প্রমীলার প্রেম নজরুলকে পূর্ণতা দান করেছে, কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই মহতী প্রেমের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থে নজরুল অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। এমন একটি কবিতা নিচে দেওয়া হল-

কবি-রাণী

তুমি আমায় ভালবাস তাই তো আমি কবি।

আমার এ রূপ–সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ।।
আপন জেনে হাত বাড়ালো–
আকাশ বাতাস প্রভাত–আলো
বিদায় বেলার সন্ধ্যা তারা
পূবের অরুণ রবি-
আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায় ।।
তুমিই আমার মাঝে আসি–
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি,
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণী। তোমার সবি ।।
তুমি আমায় ভালবাসো তাইতো আমি কবি
আমার এ রূপ– সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ।।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, নজরুলের অমেয় কবিসত্ত্বা প্রমীলার কাছে দু'হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, শক্তি ও প্রেরণা পেয়েছে। যে নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা কবিতায় 'স্বল্পকল্পনাচেতন ইন্দ্রিয়ঘনত্ব' (আব্দুল মান্নান সৈয়দ)–এর একটি ধারা প্রবাহিত করেছেন তাঁর সে কালজয়ী প্রয়াসের পিছনে প্রমীলার সদর্থক প্রেরণা নিহিতার্থে কাজ করেছে।

তাঁর প্রিয় দুলিকে উপলক্ষ্য করে নজরুল কী অসামান্য কাব্য সৃষ্টি করেছেন নিচের এই কবিতাটিতে আমরা আরো একবার তার প্রমাণ পাই। কবিতাটি আমরা অংশত উদ্বৃত করছিঃ

দোদুল দুল
(আরবি মোতাকারিব ছন্দ)
দোদুল দুল
দোদুল দুল
বেণীর বাঁধ
আলগ্‌-ছাঁদ
খোপার ফুল
কানের দুল
খোপাঁর ফুল
দোদুল দুল্‌
দোদুল দুল্‌
....
....
সোহাগ্‌-ঘায়
দোলন-পায়
কাঁপন খায়
আপন পায়,
পায়ের নখ
মাথার চুল
দোদুল দুল্‌
দোদুল দুল্‌
....
....
কাঁকাল ক্ষীণ
মরাল গ্রীব
ভুলায় জড়
ভুলায় জীব,

গমন-দোল্
অতুল-তুল্
দোদুল-দুল্
দোদুল-দুল্।
হাসির ভাস
ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ,
আঁখির লাস,
নয়ন-নীর
অধর ফুল
রাতুল তুল
রাতুল তুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !
মৃণাল হাত
নয়ন-পাত
গালের টোল,
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল,
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল ?
কোথায় তুল
কোথায় তুল ?
স্বরূপ তার
অতুল তুল

রাতুল তুল
কোথায় তুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ ।।

প্রিয়াকে উপলক্ষ করে এবং সরাসরি প্রিয়ার নাম লিপিবদ্ধ করে এমন অনবদ্য প্রেমগাধা কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও স্থায়ী সম্পদ। এই সম্পদ–সৃষ্টি হয়েছিল আশালতা 'প্রমীলা'র অসাধারণ গুণের কারণেই। মরাল গ্রীবা ও রাতুল চরণের মৃদুমন্দগামিনী, সর্বগুণান্বিতা প্রমীলার কোন তুলনা হয় না, একথা নজরুল নিজেই লিখেছেন। এ থেকে আমরা প্রমীলার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। তাঁর ঐশ্বর্য যেমন বাইরের তেমনই হৃদয়ের। "আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব"- রবীন্দ্রনাথের এই গানের অনুপম বাণীমূর্তি ছিলেন প্রমীলা নজরুল ইসলাম।

(৮)

হুগলিতে নজরুল–প্রমীলার বিবাহিত জীবনের দিনগুলি খুবই মধুর হয়ে উঠেছিল। মোগলপুরা গলির বাসা–বাড়িটিতে মানুষজনের আনাগোনা লেগেই থাকত। হুগলির 'যুগান্তর' দলের তরুণ কর্মীবৃন্দ– হামিদুল হক, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, সিরাজুল হক, বিজয় মোদক, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিকে ঘিরে থাকতেন। কলকাতা থেকে নামকরা শিল্পী–সাহিত্যিকেরা আসতেন। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা ও অপরাপর তরুণ বিপ্লবীগণ আসতেন। হাওড়ার খ্যাতিমান দেশকর্মী ও গায়ক হরেন্দ্র ঘোষ আসতেন।

এতো মানুষজনকে আপ্যায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন গিরিবালা ও প্রমীলা। সাধারণভাবে, আমাদের দেশের মেয়েরা অতিথি আপ্যায়নে অত্যন্ত পারঙ্গম। হাজারো অভাবের মধ্যেও মুখের হাসি বজায় রেখে তাঁরা অতিথিকে আদর-যত্ন করেন। গিরিবালা ও প্রমীলা ছিলেন সনাতন ভারতীয় নারীত্বের প্রতিভূ। সংসারে দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও হাসিমুখে তাঁরা অতিথি আপ্যায়ন করতেন।

এরই মধ্যে নতুন উদ্যমে নজরুল তাঁর সৃষ্টির কাজে মেতেছিলেন। ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি গান্ধীজী হুগলিতে এলে তিনি লেখেন সুবিখ্যাত 'চরকার গান'। 'ঘোর-ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর- ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর...।' গানটি গান্ধীজীর খুব ভালো লাগে, তাঁর অনুরোধে নজরুল কয়েকবার গানটি পরিবেশন করেন। হুগলির চাঁদনি ঘাটে গঙ্গার চড়ায় সামিয়ানা টাঙিয়ে গান্ধীজীকে মধ্যমণি করে বিশাল এক সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঐ সভাতেই নজরুল গানটি গেয়েছিলেন।

১৩৩১ সালের ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। চার-পাঁচ মাস ধরে এই আন্দোলন চলেছিল। আন্দোলনটির ভিতরের কথা ছিল এইরকমঃ

হুগলি জেলার হরিপালের অন্তর্গত রামনগরের রাজা ভারামল্ল তারকেশ্বরের সেবার জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি দান করেন। তারকেশ্বরের সেবাপূজার ভার মোহান্তদের উপর অর্পিত হয়। মোহান্তগণ হবেন দশনামা সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী রূপে (বিবাহ না করে) তাঁরা দেবসেবা করবেন- ভারামল্ল এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু মোহান্তই এই নিয়ম মানতেন না। তাঁরা নারীসঙ্গ ও

অন্যান্য কদাচারে লিপ্ত হতেন। ১৩৩১ সালে স্বামী বিশ্বানন্দ এই অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁকে সহযোগিতা করেন। দেশবন্ধু, নেতাজী প্রমুখ দেশমান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে নজরুলও চারণকবি হিসাবে এই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি লেখেন 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান।' গানটি শুরু হয়েছে এইভাবে-

জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ঐ ডুবালো পাপ চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী।
মোহের যার নাইকো অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত
মা-বোনের সর্বস্বান্ত,
করছে বেদী মূলে।

হাজারো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নজরুল যে এভাবে জাতীয় আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, চরকার গান, মোহ-অন্তের গান লিখেছেন- তার পিছনে প্রধান প্রেরণাদাত্রী দুই নারী। তাঁর শাশুড়ি গিরিবালা দেবী তাঁর সমূহ অভিজ্ঞতা দিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের নতুন সংসারটিকে গড়ে দিচ্ছেন, আর স্ত্রী প্রমীলা তাঁর কল্যাণময়ী প্রেরণা নিয়ে কবিকে দেশের কাজে সর্বতোভাবে পৌঁছে দিচ্ছেন। খান মোহম্মদ মঈনুদ্দীন সঠিকভাবেই বলেছেন,

"নজরুলের স্ত্রী-টি হচ্ছে শান্তস্বভাবা আর ভদ্র। আজকালকার মেয়েদের সাথে তাঁর কোন তুলনা হয় না। নিজে তিনি শিক্ষিতা, বিদূষী। কিন্তু যে-কোন সহজ অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারিণী গ্রাম্য

মেয়েদের মধ্যে ফেলে দিলে ইনি নির্বিবাদে তাঁদের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। (অন্ততঃ আমার স্ত্রী তো তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণা)”।

প্রমীলার প্রেরণায় নজরুলের কবি-জীবন যেমন পল্লবিত হয়ে উঠছিল, পাশাপাশি এই সময়ে তাঁদের ব্যক্তিজীবনও পল্লবিত হয়ে উঠছিল। হুগলিতে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে (তারিখ জানা যায়নি) নজরুল-প্রমীলার প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলো দেখল। তার নাম রাখা হয় আজাদ কামাল বা কৃষ্ণ মহম্মদ। পুত্রটিকে পেয়ে নজরুল পরিবার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার আকিকায় (জন্মের একুশ দিনের মাথায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠান) অনেক বন্ধুবান্ধব নেমন্তন্ন করা হল এবং জাঁকজমক করে একটি অনুষ্ঠানও হল। খাওয়া-দাওয়া, গালগল্প, হই-হুল্লোড়ে মোগলপুরা গলির বাড়িটি মেতে উঠল। নজরুল-প্রমীলা আনন্দে মেতে রইলেন সর্বক্ষণ। কিন্তু এ আনন্দ, এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না।

এই ধরনের আঘাত মানুষের সংসারে বিরল নয়। এ আঘাত মনের গভীরে যে ক্ষত সৃষ্টি করে তা বহুদিন সংগোপনে রয়ে যায়। পুরুষ তার নানা কাজের মধ্যে এই আঘাত কিছুটা ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু ঘরবন্দি নারীর পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও তা ভোলা সম্ভব হয় না। নজরুল পরিবারেও এমনটিই ঘটেছিল। সৃষ্টিশীল মানুষ নজরুল পুত্রশোকের আঘাত বুকের গভীরে রেখে ডুবে গেলেন সাহিত্যের হাত ধরে বিপ্লবের পথে। হুগলিতে তিনি ও তাঁর পরিবার ১৮ই পৌষ, ১৩৩২ সাল (৩রা জানুয়ারি, ১৯২৬) পর্যন্ত ছিলেন। হুগলিতে অবস্থান-কালে নজরুল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। দ্বীপান্তরের বন্দিনী, ঝড় (পশ্চিমবঙ্গ), অর্ঘ্য (গান), ইন্দ্রপাতন, সান্ত্বনা প্রভৃতি রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। চন্দননগর সন্তান সংঘের সরস্বতী পুজো উপলক্ষে

‘দ্বীপান্তরের বন্দিনী’ কবিতাটি লিখে নজরুল আন্দামানের রাজবন্দিদের জন্য সুবিচার চেয়েছিলেন এবং এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (উত্তরপাড়া) নেতৃত্বে আন্দোলন ঘনীভূত হয়েছিল। দীর্ঘ কবিতা ‘ঝড়’ নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার অদম্য প্রকাশ। ভাষা ও ছন্দের জাদুকরিতে কবিতাটি অনন্য। ‘অর্ঘ্য’, ‘সান্ত্বনা’ ও ‘ইন্দ্রপতন’ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের (১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯২৫ খ্রীঃ) প্রয়াণ উপলক্ষে রচিত। নজরুল দেশবন্ধুকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতামালায় ‘চিত্তনামা’ (শ্রাবণ, ১৩৩২ ব.) নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ‘চরকার গান’ ও মোহান্তের মোহ–অন্তের গান’- এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হুগলিতে থাকাকালে নজরুল পরিবার আরও একবার চকবাজারে বাসা বসল করে।

নানা কারণে নজরুল মোগলপুরে লেনের বাড়িটি ছেড়ে চকবাজারে ‘রোজ ভিলা’য় চলে আসেন। এখানে আসতেন কাব্যরসিক ও পণ্ডিত জীস্পতি ভট্টাচার্য, কবি সুবোধ রায়, গায়ক মণিভূষণ ভট্টাচার্য, বিপ্লবী পবিত্র দত্ত, নলিনী গুপ্ত, নিবারণ ঘটক, কবি গোলাম মোস্তাফা, বিদূষী মিসেস এম. রহমান ও আরও অনেকে। লোকজনে বাড়ি সবসময় গমগম করত। তাঁদের আপ্যায়নে যথারীতি অক্লান্ত গিরিবালা–প্রমীলা। কিন্তু সংসারে টানাটানি প্রচণ্ড। নজরুলের স্থায়ী কোনো রোজগার না থাকায় লেখার আয়ের ওপরই ভরসা। সে সময়ে লিখে এখনকার মতো রোজগার করা যেত না। সামান্য যে আয় ছিল নজরুলের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে অনেকেই সেক্ষেত্রেও তাঁকে বঞ্চনা করতেন। ফলে সংসারে নিঃসীম দারিদ্র। এরই মধ্যে কবি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতাগুলি লিখে চলেছেন। কী অসাধারণ মনের জোর থাকলে এমনটি সম্ভব তা আমরা অনুমান করতে পারি। পাশাপাশি তাঁর শ্বশ্রুমাতা গিরিবালা দেবীর মানসিক

শক্তির কথাও আমরা বারবার উল্লেখ করব। তিনি নজরুল-প্রমীলার সংসারের হাল না ধরলে সংসারটি গতি কী হত বলা কঠিন। হুগলির তরুণ বিপ্লবীরাও (প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন মল্লিক, বীরেন ঘোষ, সিরাজুল হক, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, সৌরী পাল প্রমুখ) এ সময়ে নজরুল পরিবারের পাশে ছিলেন। এরই মধ্যে নজরুল 'লাঙল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৫/৩৭ নং হ্যারিসন রোড (দোতলা) /পৌষ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

বিপুল কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে নজরুলের দিনগুলি কেটে গেলেও প্রমীলার বুকভাঙা কান্নার শব্দ আমরা শুনতে পাই। জীবনের প্রথম সন্তানটি চলে যাওয়ার মর্মান্তিকতা যে-কোন মায়ের পক্ষেই অসহনীয় বেদনা। স্বামী-সংসারের মুখ চেয়ে প্রমীলা এ বেদনা নীরবে সহ্য করেছেন। এই মানস-বিপর্যয়ের সময় তাঁর শরীরের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সংসারে অভাবের কারণে সে দিকটাও অবহেলিত রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে প্রমীলা কোনোদিন কারো কাছে বিন্দুমাত্র অনুযোগও করেননি। সকল দুঃখ-বেদনা হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে সৃষ্টিশীল স্বামীর মহান কাজে তিনি পরোক্ষ সহায়তা করে গেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এমন লক্ষ্মীস্বভাবা পত্নীর সাহচর্য নজরুলকে তাঁর জীবন ও সাহিত্যে স্থিত হতে পরম সহায়তা করেছিল। নজরুল-জীবনে প্রমীলার আমমন না ঘটলে নজরুলের জীবন ও সাহিত্য কেমন রূপ নিত, সে অনুমান করা বৃথা। তবে প্রমীলা এবং তাঁর মা গিরিবালা দেবী যে কবির জীবনের ধ্রুবতারা সে- বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৯২৬ সালের ৩ রা জানুয়ারি নজরুল সপরিবারে কৃষ্ণনগরে এলেন। এখানে তিনি প্রথমে হেমন্ত কুমার সরকার (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য)– এর গোয়ালপটি মহল্লায় মদন সরকার গলিতে সরকারদের পুরনো বাড়িতে উঠলেন। হেমন্তবাবু ছিলেন নজরুলের খুব ভালো বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী। তিনি নজরুল ও তাঁর পরিবারকে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে নজরুল অতিথির মতোই ছিলেন। এই অবসরে তিনি সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন'-এ তিনি সুবিখ্যাত 'শ্রমিকের গান' (ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল্ / ধর্ হাতুড়ি তোল্ কাঁধে শাবল) লেখেন। এই সম্মেলন থেকে উদ্ভূত 'দি ওয়াকার্স এণ্ড পেজেন্টস্ পার্টি'র কার্যকরী সভ্যও তিনি হয়েছিলেন।

১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণনগরে ছাত্র ও যুবকদের একটি প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন কবি সরোজিনী নাইডু। নজরুল এই সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক ও সভা–উদ্বোধক ছিলেন। উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে তিনি লিখেছিলেন 'ছাত্রদলের গান' (আমরা শক্তি আমরা দল/ আমরা ছাত্রদল)। এই সময়েই কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' (দুর্গম গিরি কান্তার মরু...) পরিবেশন করেন। দেশবন্ধু–পরবর্তী বাংলায় (দেশবন্ধুর প্রয়াণ ১৬ই জুন, ১৯২৫ খ্রীঃ) এই গানটির যৌক্তিকতা ছিল অসাধারণ। এই গানটি ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগরেই লেখা হয়েছিল। তার আগের দিন নজরুল লিখেছিলেন 'ছাত্রদলের গান'।

বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণনগর পর্বে নজরুলের প্রতিভা অত্যন্ত সক্রিয় ও বেগবান ছিল। এর পিছনে প্রমীলা দেবীর কল্যাণময়ী প্রেমের প্রেরণা

উপলব্ধি করতে আমাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু নজরুলের নিত্যসঙ্গী দারিদ্র নানাভাবে তাঁকে বিব্রত করে চলেছে কৃষ্ণনগরেও। 'লাঙল' বন্ধ হয়ে গেল। 'গণবাণী' (আগস্ট ১৯২৬/ শ্রাবণ, ১৩৩৩ ব.) প্রকাশিত হল। 'গণবাণী'তে নজরুল 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত' নামের অপূর্ব অনুবাদ-গানখানি প্রকাশ করেন। 'রক্তপতাকার গান' ও 'জাগর সূর্য্য' নামে আরও দুখানি গান প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদী ভাবধারায় পরিপুষ্টতা প্রকাশ পায় এই সকল গানে। পাশাপাশি গজল গান রচনাতেও তিনি মনোনিবেশ করেন।

চিরদুর্দম নজরুল জীবনের সকল প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সদা-বিদ্রোহী, বেপরোয়া। সংসারে তীব্র দারিদ্র, সেদিকে হুঁশ নেই তাঁর। চারহাতে সংসার ঠেলছেন গিরিবালা ও প্রমীলা। নজরুল উপলব্ধি করতেন দারিদ্র্যের কশাঘাত তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিলেন অন্যরকমের এক সহিষ্ণুতা। তাই ১৩৩৩ সালের ২৪ আশ্বিন কৃষ্ণনগরে বসেই তিনি লিখেছিলেন 'দারিদ্র্য' কবিতাটি গভীর দুঃখে তিনি বলেন-

পারি না বাছা মোর, হে প্রিয় আমার
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে- মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি। দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব? - ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস।
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই
ও যেন কাঁদিছে শুধু- নাই কিছু নাই।।

শারোদোৎসবের সময়ে লেখা এই কবিতাটিতে কবির মর্মস্পর্শী অনুভব ব্যক্ত হয়েছে। দারিদ্র্য যদিও তাঁকে মহান করেছে, তাঁর মাথায় 'কন্টক মুকুট শোভা' পরিয়ে দিয়েছে এবং 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস যুগিয়েছে, তথাপি পরিবারের দুঃসহ কষ্টে' অভাব-যাতনায় তিনি ক্লিষ্ট, পীড়িত। তাঁর সে পীড়া তাঁকে যেমন সৃষ্টির পথে ঠেলে দিয়েছে তেমনই বন্ধনে অধিকতর স্থিত করেছে। সে বন্ধনের মূলে ছিলেন মহীয়সী দুই রমণী – প্রমীলা ও গিরিবালা।

হেমন্ত কুমার সরকারের গোয়ালপট্টির বাড়িটি ছিল পুরনো আর অস্বাস্থ্যকর। হুগলি বাসের শেষ পর্বে নজরুল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরে এসেও তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তাই বাসা বদল করতে হত। কৃষ্ণনগর স্টেশনের কাছাকাছি চাঁদ সড়কে একটি বড়োসড়ো বাড়িতে তিনি উঠে যান। বাড়িটির নাম ছিল গ্রেস কটেজ। বাড়ির সামনে ছিল প্রশস্ত আমবাগান। নিরিবিলি, ছিমছাম একতলা বাড়ি। এখানে এসে নজরুল খানিকটা স্বস্তি পেলেন' এই বাড়ির কাছাকাছি ছিলেন কবির স্নেহধন্য অধ্যাপক হেম দত্তগুপ্ত। মূলত তাঁর উদ্যোগেই নজরুল গ্রেস কটেজে আসেন।

কৃষ্ণনগরে নজরুলে বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়েছিল। হেমন্তবাবু তো ছিলেনই, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কয়লা ব্যবসায়ীও নজরুলকে আর্থিক সাহায্য করেছেন। শিবনাথ ঘোষ নামে এক কলেজ পড়ুয়া তারকবাবুর নির্দেশে কবি পরিবারের বাজারপত্তর করে দিতেন। কবির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকায় অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই তিনি একাজ করতেন। গিরিবালা দেবী বাজারের ফর্দ করে দিতনে, কাছে টাকা থাকলে দিয়ে দিতেন। অন্যথায় নজরুলের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন। নজরুল কোনো

কোনো দিন টাকা দিতেন, যেদিন একান্ত থাকত না তারকবাবুই ব্যবস্থা করতেন।

এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই কৃষ্ণনগরে একের পর এক সম্মেলনে নজরুল উপস্থিত থেকেছেন, গান লিখেছেন। তাঁর পিছনে পুলিশের নজরদারিও ছিল সদাসর্বদা। অসীম মনোবল থাকায় নজরুল এই সব প্রতিকূলতা সামাল দিতে পেরেছেন। অন্দরমহলে তাঁকে যথোচিত সাহায্য করেছেন প্রমীলা ও গিরিবালা।

গ্রেস কটেজে নজরুল আসেন ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে। এই বাড়িতে আম্রকুঞ্জে তিনি অনেকগুলি 'গজল' রচনা করেন। হুগলিতে প্রথম পুত্রটি মারা যাওয়ার ধাক্কা সামলে ওঠার পর নজরুল-প্রমীলার প্রেমময়তা আরো নিবিড় হয়ে উঠেছিল। তাঁর গানে প্রাণের সে মর্মকথা আমরা খুঁজে পাই। গ্রেস কঠেজে খোলামেলা পরিবেশে প্রমীলাও খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ সে-সময়ে তিনি ছিলেন সন্তান-সম্ভবা। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬) নজরুল-প্রমীলার দ্বিতীয় সন্তান বুলবুল গ্রেস কটেজেই ভূমিষ্ট হয়।

বুলবুল আসায় নজরুল পরিবারে নতুন করে খুশির হাওয়া বইল। আর্থিক কষ্ট তো ছিলই তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ায় দুর্ভোগ আরো বেড়েছিল। কবির একাধিক বই বাজেয়াপ্ত, কবিতা লিখে অর্থের সংস্থান করাও দুরূহ। মানুষ তাঁর ওপর দাবি এবং আবদার বাড়িয়েই চলেছে, অথচ তাঁর সংসারটি কেমন করে চলে বা আদৌ ঠিক ঠিক চলে কিনা সে ব্যাপারে কারো কোন হুঁশ নেই। পাশে থাকার মধ্যে হেমন্ত কুমার সরকার ও হাতে-গোনা আর দু-একজন।

কৃষ্ণনগরের সম্মেলনের পরে পরেই নজরুল গ্রেস কটেজে এসেছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তরফে কৃষ্ণনগরে যে রাজনৈতিক কনফারেন্স হয়েছিল, নজরুল তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলন সফল করার জন্য পরিশ্রমও করেছিলনে খুব। কিন্তু সম্মেলন ব্যর্থ হলে তিনি খুবই কষ্ঠ পেয়েছিলেন। প্রমীলার কষ্ট ছিল ভিন্ন কারণে। তাঁর জীবনের প্রিয়তম মানুষটি হাজারো প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই-সংগ্রাম করে চলেছেন এবং বিন্দুমাত্র থিতু হতে পারছেন না - এই বেদনা তাঁকে কুড়ে কুড়ে খেত। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে সংসারের-প্রাত্যহিক দুর্ঘট তো ছিলই। স্নেহময়ী ও দৃঢ়চেতা জননী সর্বক্ষণ কাছে থাকায় তাঁর খানিকটা ভরসা ছিল, এই যা আশার কথা। গিরিবালার সংগ্রামের কথা পৃথক করে আর কী বলব, বাঁধা রোজগার না থাকলে সংসার চালানোর জন্য গৃহকর্ত্রীরা যে কী অসম্ভব কৃচ্ছ্রসাধন করেন, বাংলার মানুষ তা অবগত আছেন। গিরিবালা দেবীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানানো ছাড়া তাই আমাদের আর কিছু করণীয় নেই।

এহেন পরিস্থিতিতে নজরুল পরিবারে বুলবুলের আবির্ভাব যে একটি শুভকর ঘটনা বলে প্রতিভাত হয়েছিল, একথা বুঝতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কৃষ্ণ-মহম্মদের চলে যাওয়ার দুঃসহ বেদনা-ক্ষতে প্রলেপ বুলিয়ে দিতে বুলবুলের ভূমিকা খুবই কার্যকর হয়েছিল। বুলবুলের আসল নাম হল অরিন্দম খালেক। তাঁর চোখদুটি ছিল ডাগর, গলা ছিল মিষ্টি, স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ইরানের প্রিয় বিহঙ্গের মতোই নজরুল পরিবারকে সে খুশিতে ভরিয়ে তুলেছিল। বুলবুলকে পেয়ে প্রমীলার শূন্য কোল নতুন করে ভরে ওঠে। পরম স্নেহ-মমতায় তিনি পুত্রকে লালন-পালন করতে থাকেন। গিরিবালা মাথার ওপর থাকায় সংসারের কাজকর্ম নিয়ে প্রমীলাকে বিশেষ ভাবনা

করতে হত না। তিনি বুলবুলকে নিয়েই মেতে থাকেন। কাজের অবসরে নজরুলও উদ্দীপ্ত হন শিশুপুত্রের অমেয় সান্নিধ্যে।

বুলবুলের জন্মের ঠিক আগেই নজরুল কৃষ্ণনগর ছেড়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। আসন্ন প্রসবা প্রমীলাকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন শ্বশ্রুমাতা গিরিবালা দেবীর জিম্মায়। মাতা-পুত্রীর অদম্য মনোবলে প্রসব ভালোমতোই হয়। বুলবুলের জন্ম হয় সকাল ছ'টায়। সেদিনেই কৃষ্ণনগরে ফেরেন নজরুল। বর্মন পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার ব্রজবিহারী বর্মনকে ঐদিনই তিনি একটি পত্র লেখেন-

পরম স্নেহভাজনেষু -

স্নেহের ব্রজ, আজ সকাল ছটায় আমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। বৌদি আপাততঃ ভালো আছে। আমিও আজ সকালে ফিরে এলাম যশোহর, বাগেরহাট, দৌলতপুর প্রভৃতি ঘুরে। টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাম মানি-অর্ডার করে পাঠাও। তুমি তো সব অবস্থা জান। বলেই এসেছি তোমায়। কেবল 'সঞ্চিতার' প্রুফ পেলাম- 'সর্বহারা'র শেষ প্রুফ কই? 'সর্বহারা' কখন বেরুবে? যেদিন বেরুবে অন্তত ৫০ কপি পাঠিয়ে দেবে। ভুলো না যেন। টাকা কর্জ করেও পাঠাও। স্নেহাশীষ নাও। পত্র দিও।

ইতি
তোমার কাজীদা

এই চিঠি থেকে পরিবারে আর্থিক অবস্থা এবং নজরুলের মনের খবর আমরা পাচ্ছি। সদ্যপ্রসবা প্রমীলার যেমন যত্ন (খাওয়া-দাওয়া

ওষুধপত্র প্রভৃতি) হওয়া দরকার ছিল, পারিবারিক অভাব-তাড়নায় তা সম্ভব হয়নি। শিশুপুত্রটিও ঠিক ঠিক যত্ন পায়নি। এ নিয়ে নজরুলের মনে তীব্র বেদনা ছিল। মানুষটির মনের কথা প্রমীলা বুঝতেন। তিনি সকল দুঃখ-কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করে স্বামীকে সাহস দিতেন, প্রেরণা যোগাতেন। এক্ষেত্রে প্রমীলার কাজটি ছিল আরো কঠিন। সনাতন ভারতীয় নারীর এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। সর্বংসহা ভাবটি তাঁর মধ্যে সর্বদা জাগরূক ছিল। এই বৈশিষ্ট্য তিনি লাভ করেছিলেন জননী গিরিবালার কাছে।

১৩৩৩ সালের অঘ্রান মাসে পূর্ববঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে নজরুল প্রার্থী হন। ফলে কৃষ্ণনগর ছেড়ে তাঁকে কলকাতা-ঢাকা-ফরিদপুর-বাকেরগঞ্জ-ময়মনসিংহ ছুটে বেড়াতে হয়। কংগ্রেসের সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে তিনি নির্বাচনে নেমেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রত্যাশিত সাহায্য না করায় পরাজিত হয়ে তিনি ফিরে আসেন। আর্থিক অস্বচ্ছল সংসারে নতুন করে বোঝা চাপল, কারণ নজরুলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ফলে তিনি ঋণ কাঁধে নিয়ে কৃষ্ণনগরে ফেরেন।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৩৩৩ সালের কার্তিক-অঘ্রান মাসে নজরুলের অনুপস্থিতিতে শিশু বুলবুলকে নিযে গিরিবালা-প্রমীলাই সংসার সামলেছেন। দুজন রোজগারহীনা নারীর পক্ষে এ যে কী কঠিন কাছ ছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি। এদিকে নানা ভাবনা-চিন্তায় নজরুল আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হুগলিতে থাকাকেল যে ম্যালেরিয়া তাঁকে আক্রমণ করেছিল, তা আবার চাগাড় দিল। অসুখে, দারিদ্র্যে, শিশুপুত্রের সার্বিক অযত্নে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ব্রজবিহারী বর্মনের কাছে চিঠি দিয়ে তিনি টাকা চেয়ে পাঠালেন।

ব্রজবিহারী 'ছায়ানট' ও 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' ছেপেছিলেন। কাজেই রয়ালটি বাবদ নজরুলের কিছু প্রাপ্য ছিলই। সেই সূত্রে টাকার জন্য আবেদন করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু বাংলার পুস্তক -ব্যবসায় চিরদিনই রহস্যাবৃত। তাই লেখকদের দুর্দশা মেটে না কোনোকালেই। নজরুলের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই দুর্দশা ক্রিয়াশীল থেকেছে।

ফাল্গুন মাসে নজরুলের ছেলের মুখেভাত বা অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন। কঠিন দারিদ্র্য সত্ত্বেও জন্ম-ভবঘুরে নজরুল আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখলেন না। প্রিয়তম পুত্রের অন্নপ্রাশনে বিস্তর বন্ধুবান্ধবকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন। কলকাতা থেকে সাহিত্যিক বন্ধুরা এলেন। দিল্লিতে জরুরী মিটিং থাকায় মুজফফর আহম্মদ অবশ্য আসতে পারলেন না। বুলবুলের অন্নপ্রাশনকে কেন্দ্র করে বাড়িতে চাঁদের হাট বসল। গিরিবালা অন্দরমহল দেখা শোনা করলেন। প্রমীলার আনন্দের বাঁধ ভাঙল। অনুষ্ঠান করতে গিয়ে নতুন করে কিছু ধারও হল। তথাপি নজরুল পরিবার পরম আনন্দ লাভ করল। নিঃসীম দুঃখ-বেদনার মধ্যে এমন কিছু ঘটনাই নজরুল পরিবারের প্রাণের প্রবাহ বজায় রাখতে পেরেছিল।

১০

কৃষ্ণনগরে নজরুল প্রায় তিন বছর ছিলেন। এই সময়ে তাঁর ও প্রমীলার জীবন প্রেমের অসাধরাণ পরিপূর্ণতা দেখা যায়। পবিত্র প্রেমই হাজার ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্যে দাম্পত্য-বন্ধন তথা কর্ম-প্রণোদন অটুট রাখতে পারে। প্রমীলার প্রেমের কল্যাণদায়ী শক্তি কৃষ্ণনগর পর্বে হাজারো ঝঞ্ঝার মধ্যে নজরুলকে অফুরন্ত শক্তি যুগিয়েছিল। ছাত্র-যুব সম্মেলন, নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনে নজরুল যেমন দৃপ্ত ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলেন, কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার (১৩৩৩ ব.) বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, তা প্রমীলার প্রেমের শক্তিতেই সম্ভব হয়েছিল।

প্রমীলা লিখতে জানতেন, ভালো গান করতেন। নিজের শিল্পীসত্তা বিকাশের জন্য তিনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই কিছুদূর অগ্রসর হতে পারতেন। হয়ত বা প্রতিষ্ঠা পেতেও পারতেন। কিন্তু সে পথে না গিয়ে তিনি সংসারটিকেই শুধুমাত্র আঁকড়ে ধরলেন। গর্ভজননীর সক্রিয়তা তাঁকে সাহায্য করেছিল। মায়ের প্রখর কর্তব্যপরায়ণতার মাঝে কখনো সখনো যদিও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, তিনি তথাপি শান্ত ও অবিচল থেকেছেন এবং পরম প্রশান্তিতে দামাল স্বামীর জীবন-তরণীর হাল ধরে থেকেছেন। নজরুল-জীবনের পর্যালোচনা কালে প্রমীলার অবদান সর্বত্র স্বীকৃত হয়নি। এই ত্রুটি থেকে আমাদের সরে আসতে হবে।

বাংলা ১৩৩৫ সালে নজরুল-পরিবার কলকাতায় চলে এল। তার আগে আগেই (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ ব.) নজরুলের গর্ভধারিণী জাহেদা খাতুন চুরুলিয়ায় দেহ রেখেছেন। বিষণ্ন কবি ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন সুরের জগতে। কৃষ্ণনগরেই তাঁর সৃষ্টি গভীরতা লাভ করেছিল সঙ্গীত রচনায়। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ নামে একটি উপন্যাসও তিনি সেখানে লেখেন। বুলবুলের সাহচর্য তাঁর গানের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। ছিল প্রমীলার অতলান্তিক প্রেম-প্রেরণা। সাহিত্য জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ক্রমশ ডুবে গেছেন গানে। সৃষ্টি করেছেন অন্যতর এক ভুবন। সে ভুবনের কেন্দ্রবিন্দুতেও প্রমীলা। ক্রমশ আমরা দেখতে পাব, দুই মহাজীবনের অনন্ত প্রেমময়তার আবিলতা, সংযোগের পরম নিবিড়তা ও একাগ্রতা। মৃত্যু-বিরহ-দারিদ্র্য-বেদনা ও নানাবিধ সংঘাতের মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ী কবি ও কবিপ্রিয়ার অমেয় সৃষ্টি-মহিমা।

কলকাতায় এসে নজরুল, প্রমীলা, গিরিবালা ও বুলবুল উঠলেন নলিনীকান্ত সরকারের ১৫ নং জেলিয়া টোলা স্ট্রিটের বাসায়। সেখান থেকে কিছুদিন পরে তাঁরা চলে আসেন ১১, ওয়েলেসলি স্ট্রিটে। এই বাড়িটি ছিল 'সওগাত' নামক মাসিক পত্রের অফিস ও ছাপাখানা। বাড়িটির নিচের তলায় নজরুল পরিবারের ঠাঁই হয়। এখানেও স্থান সংকুলানের কিছু অসুবিধা হয়। কারণ প্রমীলা সে সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। বিশেষত তাঁর জন্যই বেশি জায়গা প্রয়োজন ছিল। নজরুল চিন্তিত রইলেন। তখন 'ধূমকেতু'-র ম্যানেজার শান্তিপদ সিংহ বিকল্প একটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

শান্তিবাবু থাকতেন এন্টালির ৮/১ পানবাগান লেনের একটি বাড়িতে। বাড়িটি দোতলা। শান্তিবাবু একতলায় থাকতেন। বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলে গোটা দোতলাটি তিনি নজরুল পরিবারের জন্য ব্যবস্থা করে ফেললেন। অনেকটা খোলামেলা জায়গা পেয়ে বেশ সুবিধা হল। প্রমীলার পক্ষে ব্যবস্থাটি যেমন আরামদায়ক হল, গিরিবালা দেবীও খুশি হলেন।

এই বাড়িতেই প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খান সাহেব আসা-যাওয়া করতেন। তাঁর সঙ্গে নজরুলের আলাপ হল। নাড়া না-বেঁধেই খান সাহেবের কাছে নজরুল গানের তালিম নিতে শুরু করলেন। কৃষ্ণনগরে যে সাংগীতিক প্রবণতা দানা বেঁধেছিল, খান সাহেবের সাহচর্যে তা দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হল।

পান বাগান লেনের বাড়িটি আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এই বাড়িটিতে নজরুল-প্রমীলার তৃতীয় সন্তান সব্যসাচী বা সানি ভূমিষ্ঠ হয়। তারিখটি ছিল মাঘীসংক্রান্তি, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীঃ)। বুলবুল তো ছিলই, নবজাত পুত্রটিকে ঘিরেও দুঃখ-কষ্টের

সংসারে নতুন করে আনন্দ আর প্রত্যাশা দানা বাঁধে। পরবর্তী সময়ে নজরুল-প্রমীলার তৃতীয় সন্তানটি আবৃত্তির জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন।

নজরুল-জীবন কোন সময়ই নিস্তরঙ্গ ছিল না। নিত্যনতুন অভিঘাতে সে জীবন পল্লবিত ছিল। দুঃসহ আঘাত একের পর এক আছড়ে পড়েছে উন্মাদের মতো তার জীবনে। সে সকল আঘাতে একা নজরুলই নন, প্রমীলা এবং গিরিবালাও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। আবার, সুখের ছোট ছোট মুহূর্তগুলিও সকলে ভাগ করে নিয়েছেন। কন্টকময় জীবনের এই গতিময়তায় শিশুপুত্রদুটি ছিল হৃদয়ের সম্বল। বিশেষত বুলবুল মাতিয়ে রাখত সকলকে। তার প্রতিভার স্ফূরণ বেশ টের পাওয়া যেত শিশু বয়সেই তাকে ঘিরে নজরুল ও প্রমীলার আশার অন্ত ছিল না। অজানা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা সুখস্বপ্ন রচনা করতেন প্রেমময় এই দম্পতি।

কিন্তু নজরুল-প্রমীলার বেদনাময় জীবনে এ সুখও বেশিদিন টিকল না। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৯৩০) বুলবুল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। রোগটি ছিল বসন্ত। সেকালে বসন্ত রোগের ভয়াবহতা ছিল তীব্র। উদ্বিগ্ন দম্পতি পুত্রের চিকিৎসার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেন। আগেই বলেছি, বুলবুল ছিল নজরুল পরিবারে আলোকবর্তিকার মতো। তাকে ঘিরে নজরুল-প্রমীলার স্বপ্ন ছিল দিগন্ত-বিস্তৃত। শৈশব থেকেই তার মেধা ও স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়ে দুঃখী বাবা-মায়ের মন সময়ে-সময়ে, সম্ভব-অসম্ভবের নানা স্বপ্নজাল রচনা করত।

বুলবুলের প্রতি নজরুলের টান ছিল অসাধারণ। যে কোনো পিতা তাঁর সন্তানকে নিশ্চয়ই ভালোবাসেন, কিন্তু নজরুল-বুলবুলের

ক্ষেত্রে এই ভালোবাসা ছিল অন্য পর্যায়ের। ছেলেকে নজরুল যেমন কাছছাড়া করতে পারতেন না, বুলবুলও তেমনই বাবাকে ছেড়ে একদন্ড থাকতে পারত না। জনগণের কবি মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাই বাড়িতে লোকজনের ভিড় লেগেই থাকত। সেই মুহূর্তগুলিতে বাবাকে কাছে না পেয়ে শিশু বুলবুল অভিমান করত। বাবাকে যখন আলাদা করে পেত কিছুতেই ছাড়তে চাইত না।

অসুখের সময় মানুষ প্রিয়জনকে বেশি কাছে পেতে চায়। বুলবুলও অসুস্থ হওয়ার পর বাবাকে বাশি করে কাছে পেতে চাইত। নজরুলের পক্ষে সর্বদা কাছে থাকা সম্ভব হত না । প্রমীলা ও গিরিবালা আদরে–শুশ্রুষায় তাকে ভরিয়ে তুলতেন। তবু বাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত বুলবুল। অপরদিকে প্রিয়তম পুত্রের জন্য নজরুলেও চিন্তার অন্ত ছিল না। এ সময়ে তিনি নানা দিক থেকে ব্যস্ত থাকতনে। 'রুবাইয়াৎ–ই–হাফিজ'-এর অনুবাদেও হাত লাগিয়েছিলেন। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও অসুস্থ বুলবুলকে তিনি নিয়মিত সময় দিতেন। আদরে আদরে ভরিয়ে তুলতেন। যথাসাধ্য সেবা–শুশ্রূষা ও চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে ছেলেকে সারিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁর এই অশেষ চেষ্টার পিছনে তীব্র পুরুষকার ও পারিবারিক প্রেরণা শক্তি সঞ্চার করত।

কিন্তু বুলবুলের রোগটি ছিল মারাত্মক ধরনের। সে কালে গুটি বসন্তের সঠিক চিকিৎসার অভাব ছিল। তাছাড়া বুলবুলের ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপ হয়েছিল অদ্ভূত রকম। সারা গায়ে গুটি বেরিয়েছিল এমনকি চোখের মণি পর্যন্ত বাদ যায়নি। রোগের তীব্রতা শিশু বুলবুল শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারল না। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৪ শে বৈশাখ (৭ মে, ১৯৩০) কলকাতার মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাসায় চার–বছরের দুধের শিশু বুলবুল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় কাজী পরিবার আবার ভেঙে পড়ল। সন্তান-শোকের সান্ত্বনা হয় না। প্রমীলার বুক ভেঙে খানখান হয়ে গেল। গিরিবালা দেবী অনন্ত শোকের পাথর বুকে বেঁধে রইলেন। আর নজরুল ? 'রুবাইয়াৎ-ই-হা ফিজ'-এর ভূমিকায় তিনি লিখলেন (১লা আষাঢ়, ১৩৩৭ বং)

"বাবা বুলবুল,

তোমার মৃত্যু-শিয়রে বসে 'বুলবুল-ই-শিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠলাম, সেদিন তুমি- আমার কাননের বুলবুলি- উড়ে গেছ! যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?

জানি না তুমি কোথায়? যে লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ ক'রো।

তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর লিখে গেলে, তা ইরানের বুলবুলিকেও বিস্ময়ান্বিত করে তুলবে। শিরাজি-বুলবুল কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি-

" সোনার তাবিজ রুপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার। "

তিনি আরও লিখেছেনঃ 'কোন সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস ওরে চখা-ওরে আমার পলাতকা।' আবার আকুল কান্নায় গেয়েছেন, 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়।' বুলবুলের প্রয়াণে

নজরুলের প্রতিক্রিয়া জানা গেলেও প্রমীলার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষত জানার কোন উপায় নেই। এ পোড়া দেশে মেয়েরা বুকের দুঃখ বুকে চেপে রেখেই সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রমীলাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর মাথায় দায়-দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। সংসারের হরেক ঝামেলা ও কাজকর্মের পাশাপাশি সংবেদনশীল স্বামীটির কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। বুলবুলের বিরহে নজরুল যেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, প্রমীলার সেক্ষেত্রে শক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সন্তান হারানোর দুর্মর বেদনায় তিনিও মূহ্যমানা ছিলেন। তথাপি স্বামী ও সংসারের মুখ চেয়ে তাঁকে কঠিন ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। আসাদুল হক 'অন্তরঙ্গ আলোকে নজরুল ও প্রমীলা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দারুণ অর্থাভাব কোনদিন কবি নজরুলকে দমাতে পারেনি। কিন্তু বুলবুলের মৃত্যু তাঁদের দু'জনার (নজরুল-প্রমীলা) জীবনেই দারুণ আঘাত হানে। স্বামীর ঐ সংকটময় সময়ে প্রমীলা নিজেকে সামলে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে কবিকে সান্ত্বনা দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করতেন। কবি যতটা সময় বাড়ীতে থাকতেন সব সময়েই কেবল বুলবুলের স্মৃতি তাঁকে পাগল করে তুলতো। প্রমীলা পাশে থেকে তাঁকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

প্রমীলার এই কঠিন চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। শোকাতুর স্বামীর সন্তান-বিয়োগ-ব্যথা ক্রমশ এমন আকার ধারণ করল যে সূক্ষ্ম দেহে তিনি প্রিয়তম পুত্রকে দেখতে চাইলেন। এই অলৌকিক ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি লালগোলা মহেশনারায়ণ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদারের শরণ নিলেন। বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের সূত্রে তাঁর (নলিনীকান্ত) পৈতৃক বাসভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা গ্রামে জমিদার বাড়িতে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে বরদাচরণের সাথে নজরুলের আলাপ হয়েছিল। পুত্র-শোকাতুর নজরুল গৃহযোগী বরদাচরণের সঙ্গে

যোগাযোগ করে তাঁকে মনের অবস্থা জানালেন। বরদাচরণ তাঁকে আশ্বাস দিলেন। কলকাতায় ফিরে নজরুল মেতে উঠলেন ইচ্ছাপূরণের বিচিত্র এক খেলায়।

নজরুলের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, গুরুর কৃপায় তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারবেন। একটি ঘরে বুলবুলের ব্যবহার করা জিনিসপত্র রেখে দিয়ে তিনি ধ্যানে বসতেন। এমনই ধ্যানাবস্থায় বুলবুলের দেখা পেয়েছিলেন বলে নজরুল তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কাউকে কাউকে বলেছিলেন এমন কথা আমরা কোন কোন গ্রন্থ থেকে জেনেছি। বালিগঞ্জের মহানির্বাণ রোডে বরদাচরণের সাধন-কেন্দ্রেও নজরুল নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সন্ধ্যার পর ধ্যানে বসে রাতে বাড়ি ফিরতেন।

স্বামীর অস্থির অবস্থার কথা প্রমীলা বুঝতে পারতেন। নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি কবিকে স্বাভাবিক জীবনের ফেরাতে চাইতেন। কিন্তু কবি তাঁর পথে একরোখা হয়ে রইলেন। এই সময়কালটি প্রমীলার পক্ষে কী দুঃসহ যে ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। একদিকে বুলবুলের চলে যাওয়ার দুঃসহ বেদনা, অপরদিকে প্রিয়তম স্বামীর নিদারুণ মানসিক সঙ্কট। প্রমীলার মতো মহিয়সী নারীর পক্ষেই এই দুঃসহ পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তার পাশে গিরিবালা থাকায় পরিস্থিতি অনেকটা অনুকূল হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

এই সময়টাতে নজরুল প্রথমে একটি ছোট ফরাসি গাড়ি ও পরে বড়ো একটা গাড়ি কেনেন। বুলবুলের গাড়ি চড়ার শখ ছিল। সেই অপূর্ণ সাধ পূরণ করার জন্যেই তিনি বুলবুলের অকাল-প্রয়াণের পরে পরেই গাড়ি কিনেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। অবশ্য

গাড়ির প্রতি তাঁর নিজস্ব টানও ছিল। যাহোক, গাড়ি চড়ে সপরিবারে দার্জিলিঙ, রাঁচি প্রভৃতি ছোট ছোট ভ্রমণ সেরে নজরুল মনে খানিকটা শান্তি পেতে চেয়েছিলেন।

পাশাপাশি, সাহিত্যকর্মে নজরুল আপন খেয়ালে এগিয়ে চলেছিলেন। 'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থটি লেখার জন্য তিনি ইংরেজের কোপে পড়েন (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩০ অঘ্রান)। ১৯৩০ সালের ১৬ ডিসেম্বর চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রাজদ্রোহের অপরাধে কবিকে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু বিরুদ্ধ আপিলে কবি জামিন পান। ১২ চৈত্র ১৩৩৭ তারিখে সাপ্তাহিক 'আহ্‌লে হাদিস্' পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়। এরপর 'চন্দ্রবিন্দু' সঙ্গীতগ্রন্থটিও রাজরোষে পড়ে। এরই মধ্যে কবি কলকাতা-সিরাজগঞ্জ-ফরিদপুর-কলকাতা সাহিত্য সম্মেলনগুলিতে বক্তৃতা করে ফিরতে থাকেন। এই পর্বে 'সওগাত' পত্রিকার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৩৩৪ সন থেকেই নজরুলের সঙ্গে সওগাতের ভূমিকা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল।

গান লেখা চলছিল জোর কদমে। তিনের দশকে নজরুল মূলত গানই লিখেছিলেন। বিবেকানন্দ রোডে 'কলগীতি' নামে একটি গ্রামাফোন রেকর্ডের দোকানও তিনি খুলেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সে দোকান উঠে যায়। বেহিসেবি কবি নতুন ঋণের মধ্যে পড়েন। আঘাতের পর আঘাতে তাঁর পরিবার জর্জরিত হতে থাকে। গিরিবালা ও প্রমীলার দুশ্চিন্তাও বাড়তে থাকে।

এদিকে নজরুল-প্রমীলার কনিষ্ঠপুত্র অনিরুদ্ধ (নিনি) জন্মগ্রহণ করেছে (৮ই পৌষ, ১৩৩৮ / ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩১)। পরবর্তীকালে ইনি সুর-সংযোজনায় যন্ত্রসঙ্গীতে সুবিখ্যাত হন। সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধকে ঘিরে কাজী পরিবার নতুন করে স্থিতি পেতে চাইছিল। আর্থিক সংকট

সেই স্থিতিতে সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছিল। পাশাপাশি আর একটি নিদারুণ ঘটনা ঘটল। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের আগে কোনো এক সময়ে প্রমীলার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরার মতো একটি উপসর্গ দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন নজরুল। কিন্তু রোগ উপশমের লক্ষণ দেখা গেল না। দিনে দিনে প্রমীলার পা'দুটি অসাড় হয়ে যেতে লাগল। ক্রমে তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে এল। ডা. বিধানচন্দ্র রায়, ডা. নরেন ব্রহ্মচারী ও আরও অনেক বাঘা বাঘা চিকিৎসক চেষ্টা করেও রোগ নিরাময় করতে পারলেন না।

প্রমাদ গুনলেন নজরুল। আঘাতের ওপরে আঘাতে তাঁর অবস্থা বিপর্যস্ত। কী করবেন কিছু স্থির করতে পারলেন না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রমীলার পিঠে বেডসোর দেখা দিলো। প্রিয়তমা পত্নীর এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না নজরুল। রোগ নিরাময়ের জন্য তিনি পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু করলেন। স্বামীর ভালোবাসায় আপ্লুত প্রমীলা আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠলেন। কিন্তু আরো এক অঘটনও ছিল। প্রমীলার কাকীমা, নজরুলের মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীও ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। নজরুল-প্রমীলার বুকে সে বেদনা বড়ো হয়ে বাজল। এমন সময় নজরুল শুনলেন, ডায়মন্ডহারবার রোডে কদমতলায় একজন ভূতসিদ্ধ গুণিন আছে। স্ত্রীর নিরাময়ের জন্য নজরুল সেই গুণিনদের কাছে গেলেন। রোগের বিবরণ শুনে এবং রোগীকে পরীক্ষা করে গুণিন ওষুধ দিলেন। তাতে প্রমীলার পিঠের ঘা সারল। সাময়িক স্বস্তি হলেও পায়ের ব্যাপারটা ভালো না হওয়ায় দুশ্চিন্তা গেল না। আবার খবর পাওয়া গেল বীরভূম জেলার আমোদপুরের কাছে বেলে নারায়ণপুরের ধর্মরাজতলায় বাতের ভালো ওষুধ পাওয়া যায়। প্রমীলার পক্ষে সম্ভব নয় বলে বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারকে নিয়ে নজরুল ওষুধের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। গাড়িতেই

গেলেন, উঠলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাভপুরের বাড়িতে। এক শনিবার রাতে সেখানে গিয়ে পরের দিন তারাশঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আমোদপুর গেলেন এবং পুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তুলে নিয়ে এলেন। স্ত্রীর প্রতি কী অসীম ভালোবাসা থাকলে সম্ভব তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এই সময়কালে প্রমীলার মানসিক অবস্থার কথা ভাবলে মনে তীব্র বেদনা হয়। সর্বংসহা এই রমণীর জীবন ছিল প্রকৃত অর্থেই বিস্ময়কর। নজরুলের মতো মহান মানুষকে তিনি স্বামী রূপে পেয়েছিলেন। কিন্তু আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন হৃদয়ে তিনি বহন করতে পারেননি। একের পর এক আঘাত এসে হামলে পড়েছে তাঁর সংসারে। স্বাভাবিক প্রশান্তি ও ঔদার্যে সকল দুঃখ তিনি নীরবে সহ্য করেছেন, আঘাতগুলি কাটিয়ে নতুন করে পথ চলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে তিনি বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন দীর্ঘকাল। পুত্রশোকাতুর নজরুলকে মানসিক শক্তি দেওয়ার পুরো দায়িত্বও এই মুহূর্তে তাঁরই। অথচ চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ায় তাঁকে নিয়ে নতুন কষ্টে জড়িয়ে পড়লেন নজরুল। তাঁর যন্ত্রণা ও পরিশ্রম আরও বেড়ে গেল। এই সব কথা ভেবে প্রমীলা বেশ বিষণ্ন বোধ করতেন।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার মতো দৈন্য প্রমীলার কোনো কালেই ছিল না। তিনি মনস্থির করলেন নাই-বা উঠে দাঁড়াতে পারলেন, নিজস্ব শারীরিক প্রতিকূলকতা নিয়েই সংসার পরিচালনা করবেন। তিনি ভেঙে পড়লে স্বামীর সকল কাজকর্ম নিষ্ট হয়ে যাবে যে। তাই তিনি নতুন করে জীবন শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বলা বাহুল্য তাঁর গর্ভজননী-গিরিবালা দেবী পাশে থাকায় তাঁর পক্ষে এই প্রতিকূলকতার মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

প্রমীলা দেবীর জীবনকথা আলোচনা করলে আমাদের দেশের দুঃখী মেয়েদের কথাই মনে পড়ে। দু'তিন দশক আগেও আমরা দেখেছি দেশের সাধারণ ঘরের মেয়েরা কী অসীম পরিশ্রম করে সংসার সামলেছেন। খাওয়া-পরার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময়ও তাদের ছিল না। এখনও কোনো কোনো পরিবারে এমন মেয়েদের দেখা যায়। বেদনার কথা এই যে, দুঃখ-দারিদ্র্য ও যাবতীয় অস্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে এঁদের জীবন কেবল দিয়ে যাওয়ার জন্যই, বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তির আশা এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। আবার প্রমীলার মতো রমণী যিনি নিজে সুন্দর গান গাইতে পারতেন, কবিতা লিখতে জানতেন এবং আরো নানা গুণে পারদর্শী ছিলেন, প্রতিভাবান স্বামীর পূর্ণ বিকাশে তিনি আজীবন নিজের গুণাবলি উপেক্ষা করে সংসারের হাল ধরে থেকেছেন। ভারতীয় নারীর সনাতন ত্যাগের আদর্শ প্রমীলার মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেখতে পাই। পাশাপাশি তাঁর অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রে যেমন অন্যতম এক মাত্রা যোগ করেছিল তেমনই নজরুল-প্রতিভাকে রক্ষা করার ব্যাপারেও নিয়ামক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মৃদুভাষী, সদা-সংযত, কোমলপ্রাণ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই নারী ভারতের ইতিহাসে সামান্য পরিমাণে হলেও আলোচনা দাবি করতে পারেন কারণ তাঁর স্বভাবগুণেই হাজারো ঝঞ্ঝার মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ভারত ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করতে পেরেছেন।

পুত্রশোকে অধীর নজরুল যোগচর্চা, গান, চলচ্চিত্র পরিচালনা, নাটক, ছায়াছবিতে সুর সংযোজন প্রভৃতি কাজে ডুবে রয়েছেন। পুত্রশোক ভোলার জন্য ডি. এম. লাইব্রেরিতে বসে 'চন্দ্রবিন্দু' নামে হাসির গানের বই লিখেছেন। আবার সে সঙ্গীত-গ্রন্থের বাণী ভাব-তাৎপর্য উলপলব্ধি করে ইংরেজ সরজার তা নিষিদ্ধও করেছেন।

বালিগঞ্জের মহানির্বাণ রোডে বরদাচরণ মজুমদারের যোগাশ্রমে রোগ সন্ধ্যায় যোগসাধনায় বসে গভীর রাতে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর আয়ত চোখদুটি লাল হয়ে উঠত। যোগবিদ্যার মাধ্যমে তিনি কিছু শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ প্রমীলার ব্যাধির ক্ষেত্রে তিনি কিছু শক্তিপ্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এমন কথা শোনা যায়। কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত নিতাই ঘটক ও জগৎ ঘটকের স্মৃতিকথা থেকে পাইঃ "দেখ যোগসাধনা করতে বসে আমি (নজরুল) বিরাট থেকে বিরাটতর হয়ে যাই। আমার মাথা ঐ কড়িকাঠে ঠেকে। তোদের বৌদিকে যোগবলে আমিই সারাব। মাসীমাকে (গিরিবালা দেবী) সান্ত্বনা দিয়ে তিনি সত্যি সত্যি দুলি বৌদির মাথার কাছে যোগাসনে বসলেন। স্বয়ং বিধানচন্দ্র যাঁকে ২৪ ঘন্টার মেয়াদের বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন দু'দিন পার হয়ে গেল রোগিনীর রোগ যেখানে ছিল সেই পর্যন্তই থেকে গেল– জানুদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে থেমে থাকল। রোগিনী অবশ্য উঠবার বা চলবার শক্তি হারালেন, একমাত্র বিছানাই তাঁর আশ্রয় হল। কিন্তু জানুদেশের ঊর্দ্ধের দৈহিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত কিছুই অবিকল বজায় থাকল, স্বাস্থ্য দিন দিন সুন্দরতর হতে থাকল। ডা. বিধানচন্দ্রকে এই অবস্থার কথা পরে জানানো হয়েছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন, কি জানি আমার ডাক্তারি বিদ্যায় তো এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।" (পৃ–২২)

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সক্রিয় জীবনের শেষ পর্বে কাজী নজরুল ইসলাম অসম্ভব মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। একদিকে প্রাণাধিক পুত্র বুলবুলের শোক, অপরদিকে প্রিয়তমা পত্নীর কঠিন ব্যাধি, এই দুই অসহনীয় আঘাতের মাঝেও দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ কবি অবিশ্রাম লিখে চলেছেন। অর্থের সাশ্রয় নেই, চতুর্দিকে প্রতিকূলতা, তবু অমেয় প্রাণশক্তিতে তিনি পথ চলেছেন। প্রাণের মানুষটির এই দুর্মর পথ

চলা দেখে প্রমীলা যেমন প্রাণিত হতেন, তেমনই মানুষটির দুঃখে তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠত। তিনি কবির পাশে দাঁড়িয়ে সক্রিয় সাহায্য করতে পারছেন না, এই বেদনাই তার প্রাণে বেশি করে বাজত। তাই তিনি মানসিকভাবে আরও বেশি বেশি স্বামীর কাছে থকার চেষ্টা করতেন। নজরুলও সতৃষ্ণ নয়নে প্রমীলার দুঃখী চোখ দুটির পানে তাকিয়ে কেঁদে সারা হতেন। নজরুল-প্রমীলার এই অসাধারণ প্রেমগাধা বাংলার সাহিত্যকদের মধ্যে বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১১

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত কবি ক্ষতবিক্ষত হতে হতে এক চরম সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। ক্ষরণ চলছিল ভিতরে ভিতরে, শেষ পর্যন্ত ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (৯ জুলাই,, ১৯৪২) কলকাতা রেডিও স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানে তাঁর জিহ্বায় জড়তা দেখা দেয়। এই ঘটনায় প্রমীলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। চলচ্ছক্তিহীন জীবনের এ কোন দুর্বিপাক ঘনিয়ে ঘনিয়ে এল। তাঁর প্রাণ রুদ্ধ হয়ে এল আকস্মিক এই আঘাতে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. ডি. এল. সরকারের পরামর্শ মাফিক নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে নিয়ে যাওয়া স্থির হল। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই কবি সপরিবারে পুরী যেতে চেয়েছিলেন। পূর্ণ বিশ্রাম পেলেই ভালো হয়ে উঠবেন এমনটা তাঁর মনে হয়েছিল। ডা. সরকার পারিবারিক কারণে মাসখানেকের জন্য মধুপুর যাচ্ছিলেন। কবি মধুপুরে গেলে তিনি তাঁকে দেখাশোনা করতে পারবেন এই বিবেচনায় রোগাক্রান্ত হওযার এগারো দিনের মাথায় কবিকে মধুপুর নিয়ে যাওয়া হল। দুর্দিনের দু'একজন সাথীর সহায়তায় দুই পুত্রের সঙ্গে প্রমীলাও কবির সঙ্গ নিলেন। অসুস্থ স্বামীকে একদিনের

জন্যও কাছছাড়া করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। স্ট্রেচারে করে তা তাঁকে(প্রমীলা) হাওড়া স্টেশনে রেল গাড়িতে তোলা হয়। অসম্ভব শারীরিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি স্বামীকে আগলে নিয়ে চললেন। দাম্পত্য প্রেমের এ এক বিরল উদাহরণ। কবির মধুপুর যাত্রার পিছনে তৎকালীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের ইচ্ছায় অর্থমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

দু'মাস চার দিন পর কবিকে আবার কলকাতায় ফেরৎ আনা হয়। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে অনেকটাই। চিকিৎসা বদলের কথা ভাবা হল। খবরের কাগজের মাধ্যমে কবির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা জানান দেওয়া হল। কিন্তু হতভাগ্য এই দেশ কবির পাশে সেভাবে এসে দাঁড়াল না। গিরিবালা–প্রমীলা অসম্ভব উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। ডা. এস. এন. সেনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্তন, ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসা- কোন কিছুতেই হল না। কবির বাকশক্তি নষ্ট হয়ে গেল, লেখার শক্তিও প্রায় চলে গেল।

নজরুলের এই দুঃসহ অবস্থা দেখে প্রমীলা পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। প্রেমাস্পদের এই নিদারুণ পরিণতি তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি ও তাঁর মা নানাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কবির চিকিৎসার কথা ভাবলেন। বিমলানন্দবাবু নজরুলের চিকিৎসা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছিলেন। রোগ কখনও ভালো, কখনও মন্দ। শেষ পর্যন্ত তিলজলার লুম্বিনী উদ্যানে তাঁর মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। কিন্তু তিন মাসের চিকিৎসায় কোন উন্নতি দেখা গেল না। পুনরায় হোমিওপ্যাথি, ফকিরি চিকিৎসা প্রভৃতি চলতে লাগল।

এদিকে চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক খরচের ধাক্কায় নজরুল পরিবারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল। ডা. শ্যামাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে 'নজরুল সাহায্য কমিটি' গঠিত হল। এই কমিটি মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে পাঁচ মাস কবি-পরিবারকে অর্থসাহায্য করেন। তারপর কোন এক অজ্ঞাত কারণে ঐ সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

কবির অসুস্থতার দিনগুলিতে তাঁর ছোট ভাই কাজী আলি হোসেন চুরুলিয়া থেকে এসে কবিকে মাঝেমধ্যে দেখাশোনা, সেবা-শুশ্রূষা করতেন। গিরিবাল দেবী প্রাণাধিক জামাতাকে যত্ন করে খাইয়ে দিতেন। আর প্রমীলা? তাঁর সেবাযত্নের কথা বলে শেষ করা যায় না। কল্যাণী কাজী লিখেছেন, বাবার সম্বন্ধে তাঁর (প্রমীলা) দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবোধ ছিল অসাধারণ। গভীর রাতে সবাই যখন সুপ্তির কোলে নিমগ্ন, তখন তিনি এখা খেলে চলেছেন লুডো নয় তা নয় চাইনিজ্ চেকার। উদ্দেশ্য, বাবাকে রাতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দেওয়া। কারণ, বাবা ঠিক এক-নাগাড়ে খুমোতেন না। মাঝ-রাতে ঘুম থেকে উঠে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতেন। তাই মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম ঠক্ ঠক্ করে ঘুঁটির আওয়াজ হচ্ছে- আর থেকে থেকে একটি কন্ঠস্বর বলে উঠছে- 'এদিকে এসো-বাইরে যেয়ো না। শোনো, শুয়ে পড়ো।'"

প্রমীলা বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় অসুস্থ স্বামীকে যেভাবে সেবাযত্ন করেছেন তার তুলনা মেলা খুবই কঠিন। কবির খাওযার সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি নিজে হাতে করতেন। সবজি কোটা, মাংস কাটা, রান্নার আয়োজন- সবই করতেন। বিছানার পাশে রাখা ছোট একটা উনুনে রান্না করতেন। কবি সবজি বা মাছ-মাংসর বড়ো টুকরো পছন্দ করতেন না। তাই ছোট ছোট টুকরো কেটে সুন্দর করে রান্না করে নিজে হাতে কবিকে খাইয়ে দিতেন।

কুশা নামে কবির এক পরিচারক ছিল। তিনি কবিকে খুব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন এবং আন্তরিকভাবে সেবাযত্ন করতেন। কবি তার কাছে চুপটি করে থাকতেন। নজরুল-পরিবারে চিরকালই বাইরের লোজনকে আপন করে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কুশাও ঘরের ছেলের মতোই ছিলেন। তাকে পেয়ে প্রমীলা বেশ খানিকটা নিশ্চিত ছিলেন।

কবি খুব সৌখিন স্বভাবের ছিলেন। হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি ফিটফাট থাকতে ভালোবাসতেন। অসুস্থতার পর স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজের দেখভাল করতে পারতেন না। কিন্তু অসুস্থ কবির যাতে কোন কম অনাদর না হয় এবং তিনি স্বামীর প্রতি যথাকর্তব্য করে গেছেন। অথচ তিনি নিজেই ছিলেন গুরুতর রকমের অসুস্থ। আবার কেবল স্বামীই নয়, তাঁর দু-দুটি কিশোর পুত্র-তাদের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, আদর-আবদার সবই সামলাতে হত। অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-যত্নের ব্যাপারও ছিল।

এদিকে আর এক বিপদ ঘটল। সার্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও গিরিবালা দেবী থাকায় প্রমীলা এতকাল সাহসে ভর করে এগিয়ে চলতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই গিরিবালা দেবী হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে গেলেন। তাঁর মতো বজ্রকঠিন মানুষের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত বেমানান। কিন্তু আমাদের মনে হয় নির্মম দুঃখে ও অভিমানেই তিনি এমনটি করেছিলেন। নজরুল-প্রমীলা অসুস্থ হওয়ার পর গিরিবালাই বিস্তর ঝক্কি-ঝামেলা সামলেছেন। নিষ্ঠা সহকারে হিন্দু বিধবার আচার পালন করে, নিজের শরীরের দিকে কিংবা চাওয়া-পাওয়ার দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে তিনি মেয়ে জামাইয়ের সেবা করেছেন। কিন্তু ধর্মান্ধ সমাজ তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে নানা রকম ভ্রুকুটি করেছে। এছাড়াও নজরুল অসুস্থ হওয়ার পর বিভিন্ন দিক থেকে যে আর্থিক সাহায্য

এসেছিল তা তিনি অতিথি-অভ্যাগতদের খাওয়াতে অপব্যয় করেছিলেন, এমন অভিযোগও কেউ কেউ তুলেছিলেন। এই সব কদার্যতার জবাব দেওয়ার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। কিন্তু সামাজিক কুৎসা সহ্য করতে না পেরে তিনি একদিন কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করলেন। কলকাতায় ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার পরে-পরেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। যাওয়ার আগে তিনি সংসারের কাজ যেমন করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের শেকহ্যান্ড করানোর জন্যও রাস্তায় নেমে সাধ্যমতো কাজ করে গেছেন।

এই ঘটনার প্রভাব নজরুলের উপর না পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শোকে-দুঃখে প্রমীলা ভেঙে খানখান হয়ে গেলেন। আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক যাবতীয় চাপ এবার পুরোপুরি তাঁর কাঁধেই চাপল। মুখ বুজে এই আঘাত তিনি সহ্য করলেন। বিপদে নতুন করে কোমর বাঁধলেন। মায়ের খোঁজে বিস্তর চেষ্টা চালালেন। সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধও তাঁদের দিদিমাকে পথে পথে খুঁজে ফিরলেন। হায় ! কর্পূরের মতোই উবে গেলেন গিরিবালা। এই মহীয়সী রমণীর আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

ওদিকে প্রাথমিক উত্তেজনাগুলি আর দেখা যায় না নজরুলের মধ্যে। ভীষণ ঝোড়ো হওয়া বয়ে যাবার পর এলোমেলো পৃথিবী যেমন ধীরে ধীরে স্থিতধী হয়, কবির সেই অবস্থা। আবার কখনো কখনো ভীষণ চাঞ্চল্য হঠাৎই দেখা দেয়। অসুস্থ শরীর নিয়ে এই মানুষটিকে সামলানো কী সহজ কথা? কিন্তু প্রমীলা সে অসাধ্যও সাধন করেছিলেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে কবিকে নিয়ে যাওয়া হলে প্রমীলা সেখানে তাঁকে একা পাঠিয়ে দেননি। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে কবিকে ইউরোপে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে কাজী অনিরুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে প্রমীলাও গিয়েছেন এবং টানা দেড় বছর

নিজের শারীরিক অসুবিধা উপেক্ষা করে কবির সেবা করেছেন। দেশে ফিরে পুনরায় আত্মীয়-স্বজন, দুই পুত্র এবং পরবর্তী সময়ে দুই পুত্রবধু, অতিথি অভ্যাগত, নাতি-নাতনি প্রভৃতি দশ হাতে সামলেছেন। হাসি মুখে সব কাজ করেছেন। কোন বিরক্তি ছিল না। আবদার, অভিযোগ ছিল না। কঠিন-কঠোর ব্রত গ্রহণ করে তিনি এক আশ্চর্য জীবনের উদাহরণ আমাদের কাছে রেখে গেছেন। প্রেম ও সেবার মূর্ত প্রতীকরূপে তিনি সকলের বরণীয় হয়েছেন।

তাঁর এই দুঃসময়ে কবির কনিষ্ঠ সহোদর কাজী আলি হোসেন বরাবরই পাশে ছিলেন। আত্মমর্যাদাসম্পন্না প্রমীলা একমাত্র আলি সাহেবের কাছেই আর্থিক সমস্যার কথা জানাতেন। আলি সাহেবও সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন। কলকাতায় এসে খোঁজ-খবর করতেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে তিনি চুরুলিয়ায় গুন্ডাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে খুন হন। প্রমীলার আরো একটি বড়ো আশ্রয় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

১২

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নজরুল-পরিবার চিরকালই উন্মত্ত সাগরে অসহায় তরীর মতো ভেসে বেড়িয়েছে। নজরুলকে কেন্দ্র করে বহুজনের ফিরে গেলেও কবি নিজের জন্য কোন সুরাহাই করতে পারেননি। সারা জীবন স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি-নাতনিসহ বাসা বাড়িতে কাটিয়ে গেছেন। তাঁর বাসাবদল নিয়েই ছোট একটি বই লেখা যেতে পারে। হাজারো অসুবিধার মধ্যে এই সমস্যাটি ছিল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

ঐতিহাসিকতার শেষ পর্বে উত্তর-কলকাতার টালা পার্ক অঞ্চলে ১৫৬-সি মন্মথ রোডে কবি পরিবারের ঠিকানা হয়েছিল। প্রমীলার

জীবনের শেষের দিনগুলি এখানেই কেটেছে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে নির্মম কষ্টে এক একটি দিন অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে দুই ছেলে মানুষ হয়েছেন, জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং নতুন জীবনের স্পন্দনে কাজী-পরিবারকে নতুন প্রাণপ্রবাহে টেনে নিয়ে গেছেন।

নিদারুণ দারিদ্র্য থাকায় এবং নজরুলের ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার কারণে নিজের দিকে প্রমীলা কোনদিনই তাকাননি। স্বামী এবং সংসারই ছিল তাঁর কাছে মূল কথা। পাশাপাশি, অতিথি সেবা এবং হাজারো হ্যাপা সামলানো তাঁর চরিত্রের একটি মহান গুণ ছিল। জনাব আবদুল কাদির লিখেছেন, “কবির বন্ধু ও ভক্তদের প্রতি কবিপত্নী আজীবন অত্যন্ত আপনজনের মতো ব্যবহার করেছেন। সাংসারিক অস্বচ্ছলতার দিনেও তিনি কাউকে অভুক্ত বিদায় দেননি। কোন দিন তাঁর মুখে কেউ শোনেননি কোন অভিযোগ, তাঁকে দেখা যায়নি একটুখানি বিমর্ষ। অসীম স্নেহ ও ধৈর্যের তিনি ছিলেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি”।

এতদসত্ত্বেও মানুষের সহনশীলতার একটা সীমা আছে। আজীবন কষ্টের মধ্যে থেকে প্রমীলার জীবনীশক্তিও নির্বাপিত হয়ে আসছিল। শেষের দিকে তাঁর নিম্নাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। তাঁর দেহে রক্তহীনতা দেখা দেয়। দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। জীবনের শেষ সাত দিন এই প্রাণবতী রমণীকে কৃত্রিম অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জীবনে কোনোদিন যিনি কোনরকম কৃত্রিমতার আশ্রয় নেনি, জীবনসায়াহ্নেও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেননি। অবশেষে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই আষাঢ় (৩০ জুন, ১৯৬২) বিকেল ৫.২০ মিনিটে সুদীর্ঘ ২৩ বছরের দুঃসহ রোগভোগের পর প্রমীলা নজরুল ইসলাম টালা পার্কের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পিছনে রেখে গেলেন

অসুস্থ স্বামী, দুই পুত্র ও পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি, চুরুলিয়ার আত্মীয়বর্গ এবং অগণিত ভক্তমণ্ডলী।

আসাদুল হক, লিখেছেন, “তাঁর ইন্তেকালের খবর পেয়ে আমি যখন কলকাতা টালা পার্ক অঞ্চলের ১৫৬-সি মন্মথ দত্ত রোডে পৌঁছালাম, সারা বাড়ি তখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীদের উপস্থিতিতে ভরে উঠেছে। ...দরজায় পা দিয়েই চোখে পড়লো প্রমীলার নজরুলের স্থির প্রাণহীন দেহ উত্তরে শিরস্থান করে শোয়ানো। পরনে চওড়া লালপাড় সাদা শাড়ি, আয়ত-ক্লান্ত চোখে দুটি চিরতরে নির্মীলিত। রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহে, পান্ডুর রক্তহীনতার ছাপ...।

দীর্ঘদিনের স্মৃতি নতুন করে উদ্ভাসিত হলো, আশাহীন রোগজীর্ণ জীবনের বাকশক্তিহীন স্বামীকে সামনে রেখে চূড়ান্ত ধৈর্যের মহিমা যাঁর আচরণে ও স্বভাবে আমি অবলোকন করেছি, বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছেও যাঁর চোখে-মুখে শান্ত সমাহিত আনন্দ-দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছি, সেই মধুরভাষিণী দরদী প্রাণ মহীয়সী আজ নিঃস্পন্দ”।

জীবনাবসানের পর প্রমীলাকে যখন চুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর মাথায় ছিল টকটকে লাল সিঁদুর, পায়ে রক্তাভ আলতা। সধবা মারা গিয়েছিলেন বলে পাড়ার এয়ো-স্ত্রীরা এসে সতীসাধ্বী প্রমীলা দেবীর পায়ে আলতা ও মাথায় সিঁদুর দিয়ে গিয়েছিলেন। দুই পুত্রবধূ ও আত্মীয়-স্বজনেরা আভরণময়ী প্রমীলাকে সুন্দর করে সাজিয়ে শেষ যাত্রায় প্রস্তুত করেছিলেন। প্রমীলার দুই পুত্র, চুরুলিয়ায় কবির ভ্রাতুস্পুত্রগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গ-সাহচর্যে চুরুলিয়া গ্রামে কবির জন্মভিটায় প্রমীলা দেবীকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হল। চিরসমাপ্তি ঘটল এক মহাজীবনের।

কলকাতার মন্মথ দত্ত রোডের বাসা থেকে যখন প্রমীলাকে চিরকালের জন্য বের করে আনা হল নজরুল তখন হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রিয়তমার চিরবিদায়ের আয়োজন। প্রমীলার জীবনাবসানের পরে-পরেই নিজের কামরায় বসে নিবিষ্ট মনে তিনি কাগজ কুচিয়ে গেছেন। প্রমীলা চলে যাওয়ার পর কাজী সব্যসাচী কবিকে তাঁর (সব্যসাচীর) বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনসঙ্গিনীকে দেখতে না পেয়ে কবি কেমন যেন আনমনা হয়ে উঠেছিলেন। কল্যাণী কাজী লিখেছেন, "ভাসুর যখন বলতেন, 'বাবা চলো যাই' তিনি কিছুতেই নড়ছিলেন না। বোধহয় ভাবছিলেন- 'আমার সঙ্গে চিরদিন যে থাকত,- সে কোথায় গেলো'। অবশেষে হাত ধরে টানতে টানতে তিনি দু'পা এগোলেন বটে- কিন্তু বার বার পিছনে ফিরে শূন্য চৌকির উপরে কাকে যেন খুঁজছিলেন সে দৃশ্য দেখে চোখের জল সেদিন রোধ করতে পারিনি"।

নজরুল-প্রমীলার দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটলো। দুটি মহান প্রাণের একটি ছিঁড়ে গেল। অপর মহাপ্রাণ নির্বাক বেদনায় বাকি জীবন খুঁজে ফিরেছেন তাঁর প্রাণের অনিবার্য স্পন্দন। প্রমীলা চলে যাওয়ার পর কুশা এবং কবির পুত্র-পুত্রবধূরা কবির সেবাযত্ন যথেষ্টই করেছেন। শেষ দিকে (১৩৭৯ বঙ্গাব্দে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণে কবিকে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কবিকে আশাতীত শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করা হয়। তথাপি ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র (২৯ আগস্ট, ১৯৭৬) ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কবি বোধহয় অন্যমন নিবিষ্টতায় তাঁর প্রাণাধিক দয়িতার সন্ধান করে ফিরেছেন। হাজারো দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনার মধ্যে অবিচল হাসচর্যে যিনি স্থির ছিলেন তাঁর কথা জীবনের প্রতিটি

মুহূর্তে কবি নীরব বেদনায় স্মরণ করেছেন। হায় সে বেদনামুহূর্তের কথা ভাষায় প্রকাশ পেল না। যদি তা প্রকাশ পেত, বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে বিরহ-বিধূর প্রেমানুভবে ঋদ্ধ হয়ে উঠত।

প্রমীলার ইচ্ছা ছিল কবির পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকবেন। তাঁর ইচ্ছামতোই চুরুলিয়ার মাটিতে তিনি চিরশয়ান আছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে কবি বাংলাদেশেই লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁর ঢাকায় সমাহিত করা হয়। ফলে প্রমীলার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে যায়। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী কবির সমাধিস্থল থেকে একমুঠো মাটি এদেশে নিয়ে আসেন। একটি অনুষ্ঠানে বিপ্লবী গণেশ ঘোষ ঐ মাটি প্রমীলা নজরুলের সমাধির পাশে প্রোথিত করেন এবং সেখানে ছোট একটি সৌধ নির্মাণ করা হয়।

আমাদের মনে হয় প্রমীলার পাশে নজরুলের একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করে চুরুলিয়ার মাটিতে নজরুল, প্রমীলার স্মৃতি অক্ষয় করে রাখা হোক্। এ ব্যাপরে চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে এবং সম্প্রতি একাডেমীর উদ্যোগে সৌধটি নির্মিতও হয়েছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যদি একাডেমীর পাশে দাঁড়ান, তবে প্রকল্পটি পূর্ণতর হতে পারে। নজরুল এবং প্রমীলার ব্যবহৃত জিনিসপত্র যা নজরুল একাডেমী রাখতে পেরেছেন সেগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলেও একটি জাতীয় কর্তব্য সমাধা হতে পারে। এই কাজগুলির মধ্যে দিয়ে নজরুল-প্রমীলার যুগোত্তর সম্পর্কটিকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারব, এই বিশ্বাস সর্বান্তকরণে পোষণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আমরা আশা করব, জাতীয় এই কর্তব্য পালনে মানুষ সর্বশক্তি নিয়ে নজরুল একাডেমীর পাশে দাঁড়াবেন।

কৃতজ্ঞতাঃ

কাজী মজাহার হোসেন, কল্যাণী কাজী, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. রামদুলাল বসু, ড. বদ্রিপ্রসাদ মুখার্জী, কাজী আব্দুস সালা (কবি ভাতুষ্পুত্র), সোমা কাজী, সুপর্ণা কাজী, অনির্বান কাজী, অরিন্দম কাজী, বাবুল কাজী, খিলখিল কাজী, উমা কাজী, কবি জিয়াদ আলি, কাজী রেজাউল করিম, ড. নবনীতা বসু, অধ্যাপক সিদ্দীক আলম বেগ, শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য।